

কাঙ্গাল হরিনাথ

কাঙ্গাল হরিনাথ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীজলধর সেন

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

Printed by GOPAL CHANDRA RAY
THE PARAGON PRESS,
203-1-1 Cornwallis Street.
and
Published by GURUDAS CHATTERJI of
Messrs. Gurudas Chatterji & Sons
201, Cornwallis Street Calcutta.

সোদরোপম

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

করকমলেষু।

ভাই অক্ষয়,

যে কাজ তুমি করিলে কত ভাল হইত, সেই কাজ আমি করিলাম; সুতরাং যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, তোমার কাছে আমার সবই ভাল; বিশেষতঃ কাঙ্গালের কথা যেমন করিয়াই লিখিত হউক না কেন, তাহাই তোমার ভাল লাগিবে। সেই জন্য এই বইখানি তোমারই করে সমর্পণ করিলাম। একই উদ্দেশ্য লইয়া আজ প্রায় ৪০ বৎসর তুমি আমি চলিয়াছি—কত দুঃখ কষ্ট, কত বিপদ আপদ, কত আশা নিরাশা তোমার আমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; আজ জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতেছি, যা ছিল তা সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সুধু আছি তুমি আর আমি,—আর সম্মুখে রহিয়াছেন **কাঙ্গাল হরিনাথ**।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী—১৩২১

তোমার
জলদা—।

নিবেদন।

'কাঙ্গাল হরিনাথের' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। 'মানসী' পত্রিকায় কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত আরও কয়েকটী তত্ত্ব সংযোজিত হইয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

আমি "কাঙ্গাল হরিনাথের" জীবন-কথা লিখিবার চেষ্টা কোন দিনই করি নাই; সাধু মহাজনগণের জীবনকথা লিখিবার জন্য লেখকের যে সম্বল থাকা প্রয়োজন, আমার তাহা নাই। আমি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' প্রথম খণ্ডে কাঙ্গালের রচিত বাউলের গানের মধ্যে তাঁহার দেবহৃদয়ের যে ছবি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি কাঙ্গাল কেমন ভক্ত ছিলেন, কাঙ্গাল কেমন প্রেমিক ছিলেন। আর এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কাঙ্গাল কেমন জ্ঞানী ছিলেন, সাধনপথে তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা দেখাইবার জন্য কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদই আমার একমাত্র সম্বল হইয়াছিল। এই খণ্ডে আমি নিজে কোন তত্ত্ব-কথাই বলিবার চেষ্টা করি নাই; ব্রহ্মাণ্ড-বেদে কাঙ্গাল যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমি কেবল তাহারই কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়াছি। সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকখানি কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদেরই পরিচয় মাত্র। তবে, সেই পরিচয়ও ভাল করিয়া দিতে পারিলাম না, এই আমার দুঃখ।

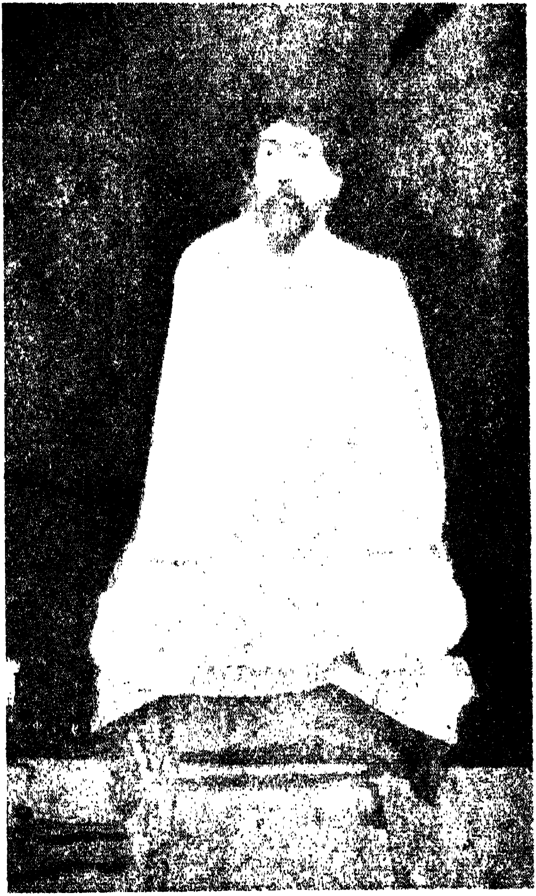
কাঙ্গাল হরিনাথের কথা বলিবার জন্য আমি কোন দিনই প্রস্তুত হই নাই। তাঁহার দেহাবসানের পর অনেকদিন চলিয়া গেল, কিন্তু কেহই কিছু করিলেন না। এই সময়ে একদিন আমার পরম স্নেহভাজন সুকবি শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বাগচী ভায়া আমাকে কাঙ্গাল হরিনাথের কথা

'মানসী' পত্রে লিখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমার অযোগ্যতার কথা বিস্মৃত হইলাম এবং সেই হইতে এই তিন বৎসর আমি 'মানসী' পত্রে কাঙ্গালের কথা বলিয়া আসিতেছি। শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ না করিলে আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। আমি ধারাবাহিকভাবে কিছুই বলি নাই ; কাঙ্গালের প্রথম জীবনের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ, সংবাদপত্র-সম্পাদনে তাঁহার কৃতীত্ব, দেশের ও দশের কার্য্যে তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন,—এ সকল কথা আমি বলিবার সুযোগ পাই নাই ; আমি কাঙ্গাল হরিনাথের জ্ঞান ও ভক্তির কথা বলিতেই চেষ্টা করিয়াছি। যদি কখন যোগ্যতালাভ করিতে পারি, তাহা হইলে কাঙ্গালের প্রথম জীবনের কথা বলিবার চেষ্টা করিব ; আপাততঃ আমি কাঙ্গালের কথা এই স্থানেই শেষ করিলাম।

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর 'কাঙ্গাল হরিনাথের' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় প্রদান করিয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্য না পাইলে আমি এত সত্বর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের চেষ্টা করিতাম না। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের খর্ব্বতাসাধন করিব না। 'কাঙ্গাল হরিনাথ' প্রথম খণ্ড যে প্রকার জনাদর লাভ করিয়াছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডও সেই প্রকার আগ্রহের সহিত গৃহীত হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী—১৩২১

শ্রীজলধর সেন।



কাঙ্গাল হরিনাথ

ব্রহ্মাণ্ড বেদ।

[১]

ব্রহ্মাণ্ড বেদ—কি ?

আমি 'কাঙ্গাল হরিনাথের' প্রথম খণ্ডে কেবল কাঙ্গালের বাউল-সঙ্গীতের কথা বলিয়াছি। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, কাঙ্গাল সুধু বাউল-সঙ্গীতই লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য গান লিখিয়াছেন। তিনি যে সময়ের মানুষ ছিলেন, তখন আমাদের দেশে 'কবির' বড় আদর ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথ অনেক কবির দলে ওস্তাদী করিয়াছিলেন। সে সময়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালী গানের খ্যাতি বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কাঙ্গাল হরিনাথও কয়েক-খানি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন; সেই সকল পাঁচালী আমাদের অঞ্চলে এবং পূর্ব্বদেশে গীত হইত এবং সে সময়ের উৎকৃষ্ট গায়ক মহাশয়েরা ও পণ্ডিতগণ একবাক্যে কাঙ্গাল হরিনাথকে দাশরথি রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি

বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কাঙ্গাল হরিনাথের পাঁচালীর মধ্যে অশ্লীল কিছুই ছিল না, থাকিবার যো ছিল না। কি পাঁচালী, কি কবি, যে বিষয়ে কাঙ্গাল হরিনাথ গান লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও অশ্লীলতার নামমাত্রও ছিল না। কাঙ্গালের গানের সম্বন্ধে এই স্থানে আর অধিক বলিব না; এক্ষণে তাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ড বেদের'ই পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

কিন্তু কথাটা এখনই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা ভাল। আমি বিনয় প্রকাশ করিতেছি না, খাঁটি সত্য কথা বলিতেছি। কাঙ্গাল হরিনাথের গানের পরিচয় আমি শুধু দুই চারিটী গান লিপিবদ্ধ করিয়াই দিয়াছি; তাহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আমার সামর্থ্যে কুলায় নাই। গানের সম্বন্ধেই যখন এমন হইয়াছে, তখন ব্রহ্মাণ্ড বেদ লইয়া আমি যে অকূল পাথারে পড়িব, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমি যে কি কারণে এমন সঙ্কোচের সহিত, এমন মৃদুপদবিক্ষেপে এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত "প্রকাশকের নিবেদন" হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। কাঙ্গালের "ব্রহ্মাণ্ড বেদ" গ্রন্থ যখন খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রথম খণ্ডের আরম্ভে প্রকাশক মহাশয় নিবেদন করিয়াছিলেন যে, "ভক্তবৎসল ভগবান যখনই কোন ভক্তহৃদয়ে আত্মতত্ত্বের বিকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন, তখনই তিনি ভক্তের সেই হৃদয়োদ্যানে প্রস্ফুটিত তত্ত্ব-কুসুমের সৌন্দর্য্য-সৌরভ জগজ্জনের হিতার্থে বিতরণ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রচারশক্তিও ভক্তহৃদয়ে প্রদান করিয়া থাকেন। 'ব্রহ্মাণ্ড বেদের' প্রচারক কাঙ্গাল ভগবদ্দত্ত সেই শক্তির বলেই নিজের হৃদয়স্থ কঠোর সাধনালব্ধ ব্রহ্মতত্ত্বের আনন্দ জগতে বিতরণ করিবার জন্য 'এই ব্রহ্মাণ্ড বেদের' প্রচার করিয়াছেন। ভগবানের আত্মতত্ত্ব প্রচার-শক্তির প্রেরণাই যে, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড বেদ

প্রকাশের কারণ ইহা কাঙ্গাল স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন———

"বাস্তবিক, এই তত্ত্বটী যখন আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম, তখন আমরা ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে ক্রটী করি নাই। কখন কি লিখিয়াছি, মাথা মুণ্ড বলিয়া লেখনীকে বিশ্রামাসনে বসাইয়াছি, কখন পাগলের মত হাসিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছি, কখন এক একটী তত্ত্বের আনন্দস্রোতে ভাসিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আসন পড়িয়া আছে, উপাসনা নাই, আহারীয় প্রস্তুত, ক্ষুধা ও ভোজনে স্পৃহা নাই, দিনরাত্রি কোন্ দিক দিয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই, বন্ধু বান্ধব উপস্থিত হইলে সম্ভাষণ নাই,—কেবল লিখিতেছি।"

জগতে দুই শ্রেণীর সাধক দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। এক শ্রেণী—শাস্ত্রোক্ত গুরুর উপদেশে ব্রহ্মতত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া সদ্‌গুরুর কৃপায় ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব ধারণায় সিদ্ধ হন, অপর শ্রেণী—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে অগ্রে নিজেই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া পরে সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রচারক কাঙ্গাল শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাধক। তাই তিনি যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে সমাহিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড বেদে তাহারই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থের নাম "ব্রহ্মাণ্ড বেদ" হইবারও তাহাই একমাত্র কারণ। যে গ্রন্থ পাঠ করিলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক পদার্থের অন্তস্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের বেদ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই ব্রহ্মাণ্ড বেদ।

ব্রহ্মাণ্ড বেদের প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব হইতে সেই অপরিদৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অস্তিত্ব সংস্থাপন এবং সেই নির্গুণ ব্রহ্মপদার্থে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, মমতা প্রভৃতির সত্তা ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্রয়ের সরল গভীর তত্ত্বব্যাখ্যা প্রভৃতি অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

তাহার পর ক্রমে বটবৃক্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ হইতে কাণ্ড শাখা প্রশাখা ইত্যাদির বিস্তৃতির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা হইতে পরতঃপর স্থূলাবস্থায় পরিণতিতত্ত্ব যেরূপ অপূর্ব্বভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, সাধনতত্ত্ব-পিপাসু নিজে পাঠ করিয়া অনুভব না করিলে অন্যের কথায় বা লেখায় তাহা ব্যক্ত হইবার নহে।

ব্রহ্মাংশ জীবের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মমজ্জন করিতে হইলে যোগ, জ্ঞান, ভক্তির যে কোন পথে যেরূপে অগ্রসর হইতে হইবে, গিরিরাজের কৈলাস-ধামে শিবশক্তি—উমা মহেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিতি-প্রসঙ্গে তাহা অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। সংযম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদি সাধনার অঙ্গসমূহ ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, আদি গুণসমূহের আধিক্যভেদে জীবের প্রকৃতিভেদ, সাকার নিরাকারতত্ত্বের মধুর সম্মিলন ইত্যাদি নানাভাবরসাত্মক তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাধনোন্মুখ সাধকগণের সম্বন্ধে যথার্থই পথি-প্রদর্শক শিক্ষাগুরুরূপে কার্য্য করিতেছে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যসুখে নিস্পৃহ হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের অতুল আনন্দের অভাবে যথার্থই কাঙ্গাল সাজিয়াছেন, তাঁহারা কাঙ্গালের ব্রহ্মতত্ত্বামৃতপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-বেদে অতুল্য আনন্দ, পরমা প্রীতি, ব্রহ্মরসাস্বাদে প্রভূত তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

কাঙ্গাল সংসারের চক্ষে কাঙ্গাল হইয়া কুটীরে বাস করিলেও তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-বেদোদ্যানের বিস্তৃতি নিতান্ত অল্প নহে। তিনি সুবৃহৎ ছয় খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-বেদ প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-বেদের আরও কিয়দংশ অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া গেলে ব্রহ্মাণ্ড-বেদ শেষ করিতে না পারুন, আরও অনেক দূর অগ্রসর করিতে পারিতেন।

আমি কাঙ্গাল হরিনাথের ব্রহ্মাণ্ড-বেদের অতি সামান্য পরিচয় অতিশয় সংক্ষেপে দিলাম। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, কাঙ্গালের

ব্রহ্মাণ্ডবেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার ন্যায় জ্ঞানহীন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কতদূর সম্ভব। আমি ঘোর সংসারী ; আমি দিনরাত্রি ক্ষতি-লাভ গণনায় ব্যস্ত, আমি স্বার্থসর্ব্বস্ব ; :দিনান্তে ভগবানের নাম গ্রহণ করিবার অবকাশও আমি গ্রহণ করিতে পারি না। আমি কাঙ্গালের এই পরমপবিত্র সাধনলব্ধ অমূল্য রত্নের পরিচয় কেমন করিয়া প্রদান করিব ? আমি তাহার কি জানি ? আমি তাহার কি বুঝি ?

নিজের অযোগ্যতা বুঝিয়া ও জানিয়াও আমি 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদের' কথা বলিবার জন্য কেন অগ্রসর হইলাম ? তাহার কারণ আছে। আমি কাঙ্গাল হরিনাথের ছাত্র, আমি তাঁহার শিষ্য, আমি তাঁহার দাস বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। তিনি আত্ম ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অমূল্য ভাণ্ডার ব্রহ্মাণ্ড-বেদের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকারী না হইলেও সেই ভাণ্ডার-দ্বারের প্রহরীর কার্য্য বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছি। ভাণ্ডারের কোন্ রত্নের মূল্য কত, তাহা আমি জানি না ; যে সাধনবলে তাহা জানা যায় তাহা আমার নাই ; কিন্তু কোথায় কি আছে, তাহা আমি দেখাইয়া দিতে পারিব। এই ভরসাতেই আমি কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ সম্বন্ধে লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছি। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডবেদের কোথায় কি আছে, আমি তাহা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব ; তাহার আলোচনা বা বিশ্লেষণ করিতে পারিব না।

এই গ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদ' কেন হইল, তাহার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে কাঙ্গাল বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকর্ত্তার তত্ত্ব বলিতেছে এবং উপদেশ দিতেছে বলিয়া, এতৎ গ্রন্থের 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদ' নামকরণ হইল। আত্মপর, স্বদেশ বিদেশ, খণ্ড অখণ্ড, পৃথিবী, উপগ্রহ, সূর্য্য, নক্ষত্র যাহার বিষয় অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অথবা অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের লোকেই যে কথা বলে, তাহারই নাম ব্রহ্মাণ্ড-বেদ।"

কাঙ্গাল আরও বলিয়াছেন "কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ' বলা হইল কেন? যাহার বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নাই, সে কাঙ্গাল। কাঙ্গালের বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড-বেদাধিকারের স্বত্ব তাহার বিলক্ষণ রহিয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে এই বেদের অক্ষর, শব্দ ও পদসকল দৃষ্টি এবং উচ্চারণের শক্তি না থাকিলে মনে মনে অধ্যয়ন ও তাহার অর্থকরণ, ব্যাখ্যাদি করিতে পারে। কাহার সাধ্য, এই স্বত্বাধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হয়? কাঙ্গালের নিজের আর কিছুই নাই, কিন্তু ভিক্ষা করিতে লজ্জাহীনতা বিলক্ষণ আছে। কাঙ্গাল, বন্ধুবান্ধব, গুরু, বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি এবং ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিয়া অণুমাত্র সত্য যাহা কিছু পাইবে, তাহাই আনিয়া এই ভিক্ষার ঝুলিতে রাখিবে, এবং সেই সকল কথাই বলিবে; ইত্যাদি নানা কারণে ইহার নাম 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, হইয়াছে।"

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ, আমি আছি, অথচ আমি তাহা বিশ্বাস করি না, এরূপ তর্ক-পাগলের তর্কজালে সৌভাগ্যক্রমে পতিত না হইয়া আকাশে, ধরাতলে এবং আপনার দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিয়া নিম্নলিখিত গীতির আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

এই ত রয়েছ তুমি প্রকাশিত নিজ মহিমায়।
কেমনে বলিব আমি, আমি আছি, তুমি নাই হেথায়।

১। প্রতি শিরায় অবিরত, শোণিতবিন্দু প্রবাহিত,
নিশ্বাসপ্রশ্বাসগত, প্রাণবায়ু সঞ্চারিত;
এই সব ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় কি মম চেষ্টায়।

২। এই যে, জীবের জীবন পবন, সদা করিতেছে ভ্রমণ,
বারিদ করে বরিষণ, এ কি মম ক্ষমতায়;

যদি মম ক্ষমতা হ'ত, ইচ্ছাতে পবন বহিত,
ইচ্ছাতে ঘন সঞ্চারিত, ঘন বারি বরষিত ;
সর্ব্বকার্য্য সম্পাদিত হ'ত মম ইচ্ছায়।

৩। কেবা বলে আমি হই স্বাধীন, চিরদিন তোমারই অধীন,
তুমি আছ তাই আছি আমি, নইলে, আমি আমি কোথায় ;
এ আমিত্বে তুমিত্ব প্রকাশ, তাইতে বহে শ্বাসপ্রশ্বাস,
তোমা ভিন্ন হে অবিনাশ, ঘটপট সকলই আকাশ ;
দেখিয়ে না করে বিশ্বাস মত্ত অহমিকায়। (মানব)

এই আমিত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গালের আরও দুইটি গান আছে। তাহা যেমন সরল, তেমনই সুন্দর। ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথমেই যে আত্মজ্ঞানের আভাস আছে, এই গান দুইটি তাহারই উদ্দীপক। আমরা নিম্নে সেই দুইটী গানই উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

আমি ব'লে করে বড়াই সবে মনে।
আমি যে কি, তা কি আমি জানে।

১। আমি কর্ম্ম করি ভাই, আমি আনি খাই,
আমি চ'লে বেড়াই সর্ব্বস্থানে ;
আবার জিজ্ঞাসিলে আমি, আমি বলি আমি,
বেঁচে আছি আমি প্রাণে প্রাণে। (আমি আমারে কয়)

২। ওরে, আমি দুঃখ সই, আমি সুখী হই,
আমি কথা কই আমি জ্ঞানে ;
এ কি চমৎকার ধাঁধা, আমি নিজে আঁধা,
আমি কিন্তু ভাই, আমি দেখিনে। (আমি ব'লে মরি)

৩। ওরে, কাঙ্গাল বলে হায়, যে জন আমির গোড়ায়,
আমি আমি বলায় সর্ব্বজনে ;
তারে না জানিলে ভাই, কার সাধ্য নাই,
আমি হ'য়ে আমি চেনে। (ভূতের ঘরে ব'সে)

(২)

ও তুমি কি খেলা খেলিছ ভবে, কে তা বুঝবে ভেবে।
কে তা বুঝবে ভেবে হায়, বুঝবে ভেবে অনুভবে।

১। আমি আমি বলি আমি, আমি কি বুঝিলে আমি ;
আমি কে, তা বুঝলে আমি হায়, তুমি কি তা বুঝতাম ভবে।

২। আমি আমি বলি আমি, আমি কি বুঝিনে আমি ;
'আমি কে, তা বুঝলে আমি হায়, তুমি কি তা বুঝতে তবে !

৩। মাটীর ঘরে থেকে আমি, ভাবছি একঘর মানুষ আমি ;
এই মত কি থাকবে আমি হায়, এ ঘর ছেড়ে যাব যবে।

৪। এ জগৎ ভাবি যে সময়, আমি যে ধূলিকণাও নয় ;
দীন হীন কাঙ্গাল কয় হায়, কিসের অহঙ্কার তবে।

এই আমিজ্ঞান বা আত্মতত্ত্বই সাধনার প্রথম সোপান। কাঙ্গাল অতি সহজ ভাষায় তাঁহার অনুপম গীতে এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডবেদের আরম্ভ। এই আত্মতত্ত্ব হইতে সাধক কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধনের উচ্চ স্তরে যান, তাহার কথা এই গ্রন্থে ও কাঙ্গালের গানের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি হইতে কেমন করিয়া তুমি, তার পর তিনি, তারপর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া যায়, নিম্নলিখিত গানে তাহার অভাস পাওয়া যায়। যথা—

অপরূপ মহিমায় রে।
ভুবন ভুলায় আমার জীবন ভুলায় রে।

১। অরূপীর রূপ এসে, যখন রে হৃদাকাশে,
মহিমা পরকাশে আনন্দ প্রভায় রে ;
ওরে, গগনে গগনে তখন, আনন্দময় তারা তপন,
ভেসে যায় এ তিন ভুবন আনন্দধারায় রে।

২। তারা চাঁদ আলো করে, জগতে আঁধার হরে
অরূপের স্বরূপ হেরে হৃদয়-আঁধার যায় রে ;
যখন রে সেই রূপরসে, ওরে আপন স্বরূপ যায় রে মিশে,
তখন আর পাইনে দিশে, আমি যে কোথায় রে।

৩। ত্রিভুবন আছে যাঁতে, তাঁরে দেখি আমাতে,
আমার আমিত্ব আবার তাঁতে যে মিশায় রে ;
ওরে, ভুলে যাইরে অন্য সব, জপমন্ত্র কেবল বাসুদেব,
মা-ধব মাধব প্রভাব হিয়ায় রে।

৪। তিনি নাই বলে যারা, এ হৃদয়মাঝে তারা,
একবার রে এসে ত্বরা দেখে যাক্ তাঁহায় রে ;
ওরে ; একবার দেখ্‌তে পেলে তাঁরে, তিনি নাই আর বল্‌বে নারে,
ভেসে দুই নয়ন-নীরে বিকাবে তাঁর পায় রে।

৫। কি ধন আর আছে ঘরে, আমি কি দিব তাঁরে,
আমি কেবল আমার ঘরে ছিলাম,দিলাম তাঁয় রে ;
ওরে, অন্য উপায় নাহি হেরি, আমি যে আমিত্ব হরি,
দিয়ে রে নয়ন-বারি চরণ ধোয়াই রে।

৬। অরূপীর রূপের রেখা, একবার যে পায় রে দেখা,
সে জানে মধুমাখা কত যে তাঁহায় রে ;
সে যে মত্ত হ'য়ে মধুপানে, ভ্রমণ করে পাগল প্রাণে,
কাঙ্গালের কতদিনে সে দিন হবে, হায় রে।

[২]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—ধর্ম্মের ব্যভিচার।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ জিনিষটা কি, তাহার পরিচয় আমার যতটুকু সাধ্য, দিতে চেষ্টা করিলাম। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডবেদে কাঙ্গাল হরিনাথ যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাধনলব্ধ; জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, সাধনহীন, ভজনহীন আমি কিছুতেই তাহার উপলব্ধি করিতে পারি নাই; সুতরাং আমি কেবল কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজির দুই চারিটী রত্ন তুলিয়া সুধী পাঠকগণের সম্মুখে ধারণ করিব; তাঁহারা নিজ নিজ সাধনবলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা।

ব্রহ্মাণ্ডবেদের একস্থলে কাঙ্গাল হরিনাথ যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ জীর্ণকুটীরবাসী হরিনাথের দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। তিনি বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে ধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। যাঁহারা আস্তিক নামে পরিচিত, তাঁহারা ধর্ম্মপরিচ্ছদ, ধর্ম্মভূষণ ও ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিয়া কেবল মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছেন; প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসেবা ও ধর্ম্মরক্ষা অতি অল্পলোকেই করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক নামে প্রসিদ্ধ হইতে এবং তজ্জন্য খ্যাতিলাভে শ্রুতিসুখে সুখী হইতে, ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেকেরই যাদৃশী ইচ্ছা ও চেষ্টা, দেশ যে ধর্ম্মশূন্য হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে, সেদিকে ইঁহাদিগের তাদৃশ দৃষ্টিপাত অতি বিরল। গুরু প্রভৃতি অনেক

ধর্ম্মরক্ষী সম্প্রদায় আবার বাণিজ্য ব্যবসায়ের মত ধর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, ধর্ম্মের আরও দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছেন। ক্রেতা বিক্রেতার মত গুরু শিষ্যেরও আচরণ হইয়া উঠিয়াছে। কপটতার আবরণে ধর্ম্ম এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পরীক্ষা পূর্ব্বক গ্রহণ করা সুকঠিন। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় ধর্ম্ম এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, দুষ্ট লোককে শাসন করিবার ক্ষমতা তাহার কিছুমাত্র নাই। অর্থবান্ ও ক্ষমতাবান্ লোকেরা ধর্ম্মকে দলন করিয়া আপনারাই পৃথিবীর প্রভু হইয়া অবিরত স্বার্থ চরিতার্থ করিতেছে। ইহাদিগের অনাহত প্রতাপ ও অন্যায় অবিচারে সহচরী ন্যায়পরতার সহিত ধর্ম্ম নির্জ্জন গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত আছেন। ধর্ম্মযাজক, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মবণিকবেশে লোকে পৃথিবীর এক এক প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিশেষে দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।”

আর একস্থলে কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন,—“রাজার সহিত রাজার ও প্রজার সহিত প্রজার কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই। রাজার সহিত প্রজার পিতা পুত্র সম্বন্ধ কেবল পুরাণে ও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অধিক কি সহোদর সহোদরের প্রতি স্নেহশূন্য, সন্তান পিতামাতার প্রতি ভক্তিশূন্য, প্রভু দাসের প্রতি এবং দাস প্রভুর প্রতি বিশ্বাসশূন্য। পতি-ভক্তি ও পত্নীমর্য্যাদা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; বাহিরে যাহা কিছু পতিভক্তি ও পত্নীমর্য্যাদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য স্বার্থপুতি-গন্ধে নিতান্ত দূষিত। কি পতিপত্নী, কি সহোদর সহোদরা, কি বন্ধু বান্ধব, কোথায়ও প্রকৃত প্রণয় ও শান্তিসুখ নাই। বাহিরে যে কিছু প্রণয় ও শান্তি দেখা যায়, তাহা কপটতায় আচ্ছাদিত সুতরাং কার্য্য-কালে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। বিলাস ও ইন্দ্রিয়সুখে লোকে এরূপ অন্ধ যে, সাক্ষাৎ দেবতা মাতাকে দুর্ব্বাক্য বলিতে এবং

প্রহার করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয় না। কেহ কেহ আবার মাতাকে দাসীকার্য্যে নিযুক্তা করিয়া, প্রণয়িনী ও তদীয় জননী ও ভ্রাতাভগিনীর মনস্তুষ্টি করিতে কিছু মাত্র লজ্জাবোধ করিতেছে না। লোকের অবিহিত অর্থপিপাসা এতই বলবতী যে, তন্নিমিত্ত তাহারা না করিতেছে এরূপ দুষ্কার্য্য নাই। বিলাসবাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত জ্ঞানবিবেকবিশিষ্ট মনুষ্যগণ যে সকল ঘৃণাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, পশুপক্ষী ইতর জন্তুগণও উদরপোষণের নিমিত্ত তাহা করিতে জানে না। লোকে যতই কেন সভ্যতার গৌরব না করুক, বা আপনাআপনি সভ্য বলিয়া বিখ্যাত না হউক, বাস্তবিক পৃথিবী ক্রমে পশুভাবে পূর্ণ হইতেছে। প্রজারক্ষাব্যপদেশে, অর্থ ও স্বার্থের নিমিত্ত এক ভূপতি অন্য ভূপতির সহিত বিবাদ, কলহ ও সংগ্রাম করিয়া, অকারণে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণীর রক্তে পৃথিবীকে দূষিতা করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ইতর জন্তুর যুদ্ধে আর ইহাদিগের যুদ্ধে এইমাত্র প্রভেদ যে, তাহাতে একটী কি দুইটী হতাহত হয়, ইহাদিগের এক একদিনের সংগ্রামে সহস্র সহস্র মহাপ্রাণী হতাহত হইয়া থাকে। শোকে আনন্দময়ী পৃথিবী নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ ও হাহাকার করিতেছেন। দ্বেষ হিংসা ও ব্যভিচারে শান্তিসুখের লোপাপত্তির এবং কু-প্রবৃত্তির আধিপত্যে রোগ, শোক, জরা ও অকালমৃত্যুর অবিরল সদ্ভাবে পৃথিবী পরিপূর্ণা। যে যত বঞ্চক, পরপীড়ক, পরদ্রোহী এবং কুটিল, যে লোকের অপকার যতই উপকার বলিয়া দেখাইতে পারে, পৃথিবীতে সেই ততই জ্ঞানী, সভ্য ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত।”

উপরিউদ্ধৃত কথা কয়েকটী পাঠ করিলে কাঙ্গাল হরিনাথের মহান্ দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি গভীর ক্ষোভে ও বিষাদে যে সমস্ত কথা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার মুখের কথা নহে, তাহা বক্তৃ-

তার উচ্ছ্বাস নহে, তাহা দেবহৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তি। এই কথা দেশের দশজনকে আরও সোজা কথায় বুঝাইবার জন্য তিনি যে সুন্দর গানটী রচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

মানুষ বড় কিসে ভাবি তিনবেলা।
সে'ত, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে
না বোঝে পরের জ্বালা।

১। গাছেতে ফল ধরে যত,
নত হ'য়ে বিলায় সে ত, খায় না ;
মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে,
লাগায় তালার উপর তালা।

২। গাছের তলে বস্‌লে এসে,
সে ত ছায়া দেয় রে ভালবেসে, দেখ্ না ;
কাট্‌তে গেলেও ছায়া দান করে সে,
গাছ না হয় রে উতলা।

৩। ঝড় বৃষ্টি শিলা স'য়ে,
আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে, দেখ্ না ;
যাচ্ছে এক উদ্দেশে, ঊর্দ্ধদেশে,
তার শক্তি কি অচলা।

৪। কাঙ্গাল বলে, বড় যে জন,
সে ত ফকীর হয় রে পরের কারণ, দেখ্ না ;
ওরে, ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি,
সার করে গাছের তলা।

কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রহ্মাণ্ডবেদের মূলসূত্র সহজবোধ্য করিবার জন্য অতি সুন্দর রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন। গিরিরাজ হিমালয় ও গিরিরাণী মেনকা অনেক দিন তাঁহাদের কন্যা দুর্গাকে দর্শন করেন নাই; তাই তাঁহাদের হৃদয়ে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। ইহারই নাম "আগমনী"। এই আগমনী অবলম্বন করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনসূত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই সূত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, তুষার পড়িয়া পাষাণ যখন অতি শীতল হয় এবং সূর্য্যোত্তাপে যখন তাহা অতি উষ্ণ হয়, তখন তাহাতে বাস করা কঠিন হইয়া থাকে। পাষাণখণ্ডে কাহাকেও আঘাত করিলে সেই আঘাতও কঠিন হয়। মানুষ যখন ঈশ্বর ভুলিয়া ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তখন তাহার সহিত বাস করা কঠিন হয়। সেই মানুষ আবার স্বার্থের নিমিত্ত যাহাকে আঘাত করে, সেই আঘাতও প্রস্তর-আঘাতবৎ কঠিন হয়। এই নিমিত্ত লোকে অত্যাচারী মানুষকে পাষাণ বলিয়া থাকে। আমাদের এই প্রসঙ্গের প্রধান নায়ক গিরিরাজও সেইরূপ পাষাণ এবং তাঁহার পত্নী মেনকারাণীও সেইরূপ পাষাণী। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে, প্রতি মানুষের হৃদয়েই গিরিরাজ ও মেনকা বিরাজ করিতেছেন, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ প্রতি মানবের আত্মাই গিরিরাজ এবং ভগবানের প্রেম-পিপাসাই মেনকা রাণী। এই আত্মা ও পিপাসা বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশুদ্ধ আত্মা ও পিপাসার যোগে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। প্রেম-পিপাসা মেনকাকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের ক্ষণপ্রভার প্রথম প্রকাশ পায়, তাহার পর আত্মা সাধনপথে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। এই আগমনী প্রস্তাবে সাধনতত্ত্বের ক্রমোন্নতির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

মানুষ স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচার করতঃ যতই কেন পাষাণবৎ কঠিন

না হউক, ভগবান তাহাকে কখনও ভুলেন না এং কোমল করিয়া প্রেমানুরাগের পাত্র করিতে বিরত হন না। স্বর্ণকার যেমন অবিশুদ্ধ স্বর্ণ হাফরে দগ্ধ করিয়া গড়নোপযোগী কোমল ও বিশুদ্ধ করে, ভগবানও অনুতাপ ও নানা প্রকার দণ্ডানলে দগ্ধ করিয়া মানুষকে প্রেমানুরাগ অলঙ্কারের উপযোগী কোমল ও পবিত্র করিয়া তোলেন। এ আর ভাল হইবে না, বলিয়া তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। যতদিন মানুষের হৃদয় প্রেমানুরাগের উপযোগী কোমল ও বিশুদ্ধ না হয়, তত-দিন পোড়ার উপর পোড়া ও আঘাতের উপর আঘাত করিতে থাকেন। কাঙ্গাল হরিনাথ জীবনে এ প্রকার আঘাত অনেক সহ্য করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাকে অনেকবার হাফরে ফেলিয়া পোড়াইয়াছেন। তাহার পর তিনি এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অতুল সাধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদে দিয়াছেন। সংসারে আসিয়া প্রথম জীবনে ও মধ্যজীবনে বার বার পোড়া খাইয়া কাঙ্গাল হরিনাথ প্রাণের আবেগে যে গান গাহিয়াছিলেন, আমরা তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাঙ্গাল গাহিয়াছেন——

মরি, ঐ কুবের সেকরা সোণার গয়না গড়িতেছে ।
সে যে, মিশাল সোণা হাফরে ফেলে,
খাঁটি ক'রে লইতেছে। (পোড়াইয়ে)

১। একবার খাঁটি নাহি হ'লে,
আবার দেয় হাফরে ফেলে,
পোড়ায় পোড়ায় খাঁটি ক'রে তুলিতেছে ;
ও সেই, খাঁটি সোণার নূপুর গড়ে,
মায়ের পায়ে পরাইছে। (সোণার নূপুর)

২। কত সোণা-আছে প'ড়ে,
সে দিক সে না চায় ফিরে,
যাতে গড়ন হবে তাই বাছিতেছে;
ও সে আগুন দিয়ে পোড়াইয়ে,
গলাইয়ে গড়িতেছে। (কত গড়ন)

৩। ও সে, গড়ন গ'ড়ে মাকে সাজায়,
মা আপনি সেজে আপন সোণায়,
কেমন গড়ন হয়েছে তাই দেখিতেছে,
সোণার গরবে আনন্দময়ী
সদানন্দে নাচিতেছে। (মা যে)

৪। সংসার হাফরের মাঝে,
কাঙ্গাল সদা পড়ে আছে,
কত দুঃখানলে সে ত পুড়িতেছে;
কবে নূপুর গ'ড়ে মায়ের পায়ে
পরাইবে ভাবিতেছে। (সেকরা)

কাঙ্গালের রচিত এই ভাবের আর একটী গান আছে; আমরা সেই গানটিও এই স্থানে তুলিয়া দিলাম।

ঐ দেখ, রুদ্রঘরে, কর্ম্মকারে ব'সে আছে ভাতি ধরে।
১। সে কর্ম্মের কয়লা দিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে, রেখেছে মনের হাফরে;
সে, মিশাল ধাতু যা পায়, তাই পোড়ায়, গড়ন গড়ায় খাঁটি ক'রে।
২। একবার না খাঁটী হলে, আবার কালে দেয় রে ফেলে, অমনি করে;
খাঁটি না হলে পরে, ছাড়ে না রে, সে ত কভু দয়া করে।

৩। ও যেজন হয় রে খাঁটি, দিয়ে মাটী কাম ক্রোধ বাসনারে ;
সে ত রে বারে বারে, পোড়ে না রে, চ'লে যায় অমৃতের ঘরে।
৪। কাঙ্গাল কয় আর কত কাল, পোড়াবে কাল, রুদ্র বেটা এমন ক'রে ;
তুমি মা, ধর অসি, মুক্তকেশী, মুক্ত কর এবার মোরে।
(আমি পুড়ব কত)

[৩]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—পরলোক।

প্রতিবারেই বলিতেছি, এবারও আবার বলি, কাঙ্গালের "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" লিখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যিনি যাহাই বলুন, আমি বলিতেছি "ব্রহ্মাণ্ডবেদের" পরিচয় যেমন করিয়া দিলে দেওয়ার মত হইত, যেমন করিয়া বলিলে বলিবার মত হইত, আমি তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। শুধু কি তাহাই; যখনই আমি "ব্রহ্মাণ্ডবেদের" কথা বলিতে বসি, তখনই আমার মনে হয় আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিতেছি। আমার হাতে পড়িয়া এমন পবিত্র বস্তু আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না, আমি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি। যাহাতে আমার অধিকার নাই, যে মন্দিরের ছায়া স্পর্শ করিবারও সামর্থ্য নাই, আমি তাহারই পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। একথা যখনই আমার মনে হয় তখনই ইচ্ছা হয় যে, এমন কার্য্য আর করিব না। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যখন এমন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন ভাল হউক মন্দ হউক, আমার কথা শেষ করিতেই হইবে। তবে আমার একটা ভরসা আছে, আমার অযোগ্যতায় ক্ষুব্ধ হইয়া অপর কেহ যদি এই কার্য্যে হস্তার্পণ করেন, তাহা হইলে আমার চেষ্টা যে বিফল হয় নাই, ইহা মনে করিয়া আমি কৃতার্থ হইব।

এই স্থানে এতদিন পরে একটি কথা বলিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে

পারিতেছি না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে যে সকল কৃতী সুলেখকের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল, কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় নাই, তখন কাঙ্গাল হরিনাথের "বিজয়বসন্ত" প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সে সময়ে শত শত নরনারী সেই "বিজয়বসন্ত" পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের "বিজয়বসন্ত" পুস্তকে যে ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ছিল, তাহা এখনও অনেক সাহিত্যরথীর অনুকরণীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃতজীবন কাঙ্গাল হরিনাথের কথা, তাঁহার জীবন কথা—তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথা—তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবার কথা—তাঁহার পবিত্র ঋষিকল্প জীবনের কথা—তাঁহার আধ্যাত্মিকতার কথা—তাঁহার অতুলনীয় বাউলের গানের কথা,—তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞান-ভাণ্ডার "ব্রহ্মাণ্ডবেদের" কথা—তাঁহার সংবাদপত্র সম্পাদনের কথা;—সকল কথাই বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবকগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচনায় কখন কোন দিন কাঙ্গাল হরিনাথের নাম তেমন করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পল্লীবাসী, জীর্ণকুটীরবাসী, শতগ্রন্থিযুক্ত মলিনবেশধারী কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনব্যাপী সাধনার সংবাদ কেহই গ্রহণ করেন নাই। কাঙ্গাল হরিনাথ কাঙ্গালের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাঙ্গালভাবেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। কোন দিন তিনি ধন মান যশের পশ্চাতে ধাবিত হন নাই; তাই এই অর্থসর্ব্বস্ব, ধনগর্ব্বিত যুগে কেহ কাঙ্গালের খোঁজ লইলেন না। কাঙ্গাল তাহাতে কোন দিন ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হন নাই। তিনি তাঁহার একটি গানে বলিয়াছিলেন—

"কাঙ্গালের ছেঁড়া টেনা, নাইক সোণা,
তাই, কর ঘৃণা কাঙ্গাল ব'লে ;
কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন, অমূল্য ধন,
ধনী হবে সে ধন পেলে।"

কাঙ্গাল অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়া পার্থিব ধনকে, মানসম্ভ্রমকে ধূলি জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমরা ত তাহা পারি না, আমরা ত সে অমূল্য ধনের কোন খোঁজ পাই নাই ; তাই বাঙ্গালার সাহিত্য-জগৎ, রাজনীতি ক্ষেত্র, ধর্ম্মজগৎ হইতে কাঙ্গালের নাম লুপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, ব্যথিত হইয়াছি, এবং সেই জন্যই নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আমি কাঙ্গাল হরিনাথের পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। বড় দুঃখেই এই কথা কয়টি বলিলাম !

এখন আবার কাঙ্গালের "ব্রহ্মাণ্ডবেদের" কথা বলি। অনেকেই এখন পরলোক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদে কাঙ্গাল এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা প্রদান করিতেছি। কাঙ্গাল বলিয়াছেন—

"কাহারও বিশ্বাস পরলোক নাই, আবার কাহারও বিশ্বাস পরলোক আছে। যাঁহারা পরলোক বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা পরলোক দেখেন নাই ; অতএব অবিশ্বাস করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অন্যায় নহে। তবে অন্যায়ের বিষয় এই যে, যে পথ অবলম্বন করিলে ইহলোকে থাকিয়াই পরলোক দর্শন করা যায়, তাঁহারা সে পথ অবলম্বন না করিয়া কেবল তর্ক দ্বারা পরলোক নিশ্চয় করিতে গিয়া প্রতারিত হন এবং চিরকালই পরলোক বিষয়ে অন্ধ থাকিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করেন। পরলোক কখনও তর্কে নিশ্চয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও দুগ্ধ পান করে নাই, তাহাকে দুগ্ধের আস্বাদন বুঝাইয়া দিবার জন্য যতই তর্ক করা না হউক, যতদিন সে

দুগ্ধ পান না করিবে, ততদিন দুগ্ধের কি আস্বাদ তাহা যেমন বুঝিতে পারিবে না, তদ্রূপ যে পরলোক দেখে নাই, সে যে পর্য্যন্ত পরলোকের দৃশ্য না দেখিবে সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিবে না। ইহলোকেই পরলোক-দর্শন সাধনসাপেক্ষ। বিনা সাধনে কেহ তাহা দেখিতে পান না।

আবার যাঁহারা পরলোক বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে ইহলোকে পরলোক-দর্শন ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা কেবল শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরলোক মানিয়া চলেন। সুতরাং কার্য্যকালে পর-লোকে বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রায়ই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহারা পরলোক দেখেন নাই, তাহার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের কথা কিছুই জানেন না এবং বোঝেন না। ইহলোকের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব; শাস্ত্রশাসনে ও জ্ঞানীর উপদেশে তাঁহারা তাহার প্রলোভন কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না।"

এস্থলে অনেকে এরূপ তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, আমরা ইহ-লোকের সুখৈশ্বর্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়া লোকদিগকে সন্ন্যাসী করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমাদের সংসার-বৈরাগ্যের অর্থ তাহা নহে। পার-লৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভের যাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেইরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য, জ্ঞান ও ন্যায়পরতার অনুমোদিত ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য উপভোগ করা ভগবানের অপ্রিয় কার্য্য নহে; বরং তাহাই তাঁহার ইহলৌকিক প্রিয়-কার্য্য সাধনের উপায়।

কিরূপে ইহলোকেই লোকের হৃদয়ে পরলোকের দৃশ্য প্রকাশিত হইতে পারে; সে সম্বন্ধে কাঙ্গাল যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমা-দিগের বাহিরে যেমন দুইটী চক্ষু আছে, সেই চক্ষুর দর্শনীয় বিষয় যেমন ইহ-লোক; তদ্রূপ অন্তরেরও আর একটী চক্ষু আছে, তাহার দর্শনীয় বিষয় পর-

লোক। বাহিরের চক্ষুতে কেবল দর্শন করা যায়, অন্তরের চক্ষুতে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ সকলই হইয়া থাকে। ইহলৌকিক বস্তু সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানযুক্ত হইলে যেমন ইহলৌকিক দর্শন ক্রিয়া হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগে পারলৌকিক দৃশ্য সকল জ্ঞানযুক্ত হইলেই পারলৌকিক দর্শন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এখন একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় যেমন ইহলৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু, সেইরূপ পারলৌকিক প্রত্যক্ষেরও হেতু আছে। সেই হেতু জ্ঞান ও ভক্তি। যাঁহার জ্ঞান আছে ভক্তি নাই, তিনি অন্ধের ন্যায় পারলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান না। যাঁহার ভক্তি আছে জ্ঞান নাই, তিনি অন্যমনস্ক মনুষ্যের মত চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তির যোগ, সেই স্থানের দৃশ্যই পরলোক।

অনেকে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ভক্তি তবে কি ? এবং মনুষ্যের যে ভক্তি আছে, তাহা কিরূপে জানা যাইতে পারে ? আমরা বলিতেছি, জ্ঞান ত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে ; তবে, জ্ঞান আছে, ইহা যে কারণে স্বীকার করিয়া থাকি, সেই কারণে ভক্তি আছে, এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তি কি ?

ব্রহ্মাণ্ডই আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের দৃশ্য। আবার তাহার অনেক পদার্থই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য :নহে। তৎসমুদায় কি আমরা নাই বলিয়া বিশ্বাস করি ? আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি জ্ঞানাদি কিছুই দ্রষ্টব্য নহে, অথচ তৎসমুদায় কি নাই বলিয়া আমরা অবিশ্বাস করিয়া থাকি ? এই ত আমরা "আমি, আমি" বলিয়া সর্ব্বক্ষণ চীৎকার করিতেছি; আমার সংসার, আমার ঘর বাড়ী বলিয়া কত কথা বলিতেছি, এবং মৃত মনুষ্যের শরীর দেখিয়া, আমার শরীর যে আমি নহে, তাহাও বুঝিতেছি। কিন্তু আমি যে কি, কেহ কি কখন দেখিয়াছি ? আমি, আমাকে না দেখিয়াও যখন

'আমি' বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিতেছি, তখন পরলোক দেখা যায় না বলিয়া তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? তাহার পর পূর্ব্বেও বলিয়াছি, সাধন করিলেই অন্তর-আঁখি ফুটিয়া উঠে এবং পরলোক প্রত্যক্ষ হয়; তখন আর অবিশ্বাসের স্থান থাকে না।

এই কথাটা সহজ করিবার জন্যই কাঙ্গাল নিম্নলিখিত গানটী করিয়াছিলেন—

কি হয় মানুষ মলে, ও তাই জিজ্ঞাসে রে সব জনা।
মানুষ মলে যা হয় তাই হয়েছে, একবার ভেবে দেখ না।
১। আত্মন্তরী আত্মসুখী পশুর লক্ষণ, ভেবে দেখ না রে মন;
পশুপ্রবৃত্তি যার, পশু সে জন, হবে যা হয় রে সে জনা!
২। আপনাকে চেনে যে জন, মানুষ সে জন হয়, কেবল মানুষ মানুষ নয়;
মানুষ দেবতা হয় দেবতা হবে, (ক'রে) জগতের হিতসাধন।
৩। পশুর প্রবৃত্তি যার কিছুমাত্র নাই, জীবে দয়া সর্ব্বদাই;
সে ত মানুষ হ'য়ে দেবতা হয়, যা হবে তাই হয় সে জনা।
৪। কাঙ্গাল বলে যোগী ঋষি সাধক প্রধান, যাঁদের জগৎ সমজ্ঞান,
তাঁরা ঋষি ছিলেন, ঋষি হ'লেন, করেন অন্তরীক্ষে সাধনা।

পরলোক সম্বন্ধে কাঙ্গালের কি মত, তাহা আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম। কাঙ্গাল বলিতে চান যে, ও সকল কথার মীমাংসা তর্কের দ্বারা হয় না, সাধনার দ্বারা হয়। প্রথমেই পিপাসা চাই; পিপাসা হইলেই তাহার নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইবেই; সেই ব্যাকুলতাই পথিপ্রদর্শককে আনিয়া দিবে। তাহার পর সেই পথিপ্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহার পর যাহা অপ্রত্যক্ষ ছিল তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। তাহার পর—তাহার পর যাহা, তাহা তিনিই বলিতে পারেন যিনি—

"চোক তাকালে আঁধার দেখেন, মুদ্‌লে সলক হয়"

উপরে যে ব্যাকুলতার কথা বলিলাম সেই সম্বন্ধে কাঙ্গালের একটা সুন্দর গান আছে ; আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি, (তোমায়) দুটি হাত বাড়ালে।
১। ছিলাম যখন মার উদরে
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে ;—
তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে,
তুমি আমারে বাঁচালে।
২। আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলাম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম, হায় রে ;—
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে।
৩। দিলে, বন্ধুবান্ধব দারাসুত,
ও নাথ, সে সব কৌশল তোমারই ত, হায় রে ;—
ও নাথ! ধন ধান্য সহায় সম্পদ,
পেলাম তোমার দয়াবলে।
৪। তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায় রে ;—
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে,
আমি কাঁদ্‌লে কর কোলে।
৫। আমি, কাঁদ্‌লে ব'সে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে, হায় রে ;—

আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে,

কত উপদেশ দাও ব'লে।

৬। ও নাথ! দেখা নাহি দিবে আমার,

এই ইচ্ছা যদি ছিল তোমার, হায় রে ;—

ওগো তবে কেন শাকের ক্ষেত,

তুমি দেখালে কাঙ্গালে।

এই গানটীর সঙ্গে সঙ্গেই কাঙ্গাল আর একটী গান রচনা করিয়াছিলেন। আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু বোধ হয় কাঙ্গাল উপরে উদ্ধৃত গানটী যে দিন লেখেন, যখন লেখেন, তখনই নিম্নলিখিত গানটী লেখেন। আমরা সে গানটীও এখানে দিতেছি। এই দুইটী গান পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, কাঙ্গাল হরিনাথ কি ছিলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া, প্রাণের আবেগে গান করিলেন—

"এত ভালবাস থেকে আড়ালে"

তাহার পরই তিনি বুঝিলেন যে, তিনি ত আড়ালে থাকিতে চান না, থাকেন না। আমরা যে তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকি না, তেমন ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে চাই না ; তাই তিনি আড়ালে থাকিয়া ভালবাসেন। অমনই কাঙ্গাল গাহিয়া উঠিলেন———

যদি, ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।

তবে কি মা! এমন করে তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পার্‌তে।

১। আমি, নাম জানি না, ডাক জানি না,

আমি জানি না মা, কোন কথা বল্‌তে ;—

তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,

আমার জনম গেল কান্‌তে।

২। দুঃখ পেলে মা তোমায় ডাকি,

আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে ;—

তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা !

আমায় দেখা দেও না তাইতে।

৩। ডাকার মত ডাকা শিখাও,

না হয়, দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে ;—

আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি,

কেবল ভুলে যাই নাম কর্‌তে।

৪। কাঙ্গাল যদি ছেলের মত

মা তোর ছেলে হ'ত, তবে পারতে জান্‌তে ;—

কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত,

নাহি সর্‌ত বল্লে সর্‌তে।

উপরিলিখিত দুইটী গান পাঠ করিলেই, আমার মনে হয়, কাঙ্গাল হরিনাথকে বেশ চিনিতে পারা যায়। তিনি মাকে ডাকিলে তিনি তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইতেন ; দীন হীন কাঙ্গাল তখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরত্ব তুচ্ছ করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। তাই তিনি গায়িয়াছেন——

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ যে আমার দিবানিশি।

১। যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।

২। হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপরাশি ;
কিন্তু তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘ আসি।

৩। কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া ক'রে, দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
আমি সংসারের মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভ'রে কই ভালবাসি।

কাঙ্গাল হরিনাথ যে ভাবের ঘোরে গায়িয়াছিলেন "এত ভালবাস থেকে আড়ালে" ঠিক সেই ভাবে পাগল হইয়াই আর একজন সাধক লালন ফকির গায়িয়াছিলেন———

আমি একদিনও না দেখিলাম তাঁরে।

আমার ঘরের কাছে আরসী নগর, তাতে এক পড়সী বসত করে।

১। গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারের ;
আমি, মনে করি দেখব তাঁরে, আমি কেমনে সেথা যাই রে।

২। বল্‌ব কি পড়সীর কথা, তার হস্ত পদ স্কন্ধ কিছুই নাই রে ;
সে যে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর, আবার ক্ষণেক থাকে নীরে।

৩। সেই পড়সী যদি আমার হ'ত, তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে ;
আবার সে আর লালন এক স্থানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

[৪]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—ব্রহ্মরূপ

ব্রহ্মরূপ বা সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কত জন কত কথা বলিয়াছেন, কত আলোচনা করিয়াছেন, কত আলোচনা করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও কত আলোচনা চলিবে। যিনি যে ভাবে সাধনা করিতেছেন, যিনি যে ভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যিনি সাধনবলে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। আর যাঁহারা সাধন ভজন কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁহারা শুষ্ক তর্কজাল বিস্তার করিয়া বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। কাঙ্গাল হরিনাথ নিজের সাধনবলে ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তিনি "ব্রহ্মাণ্ড-বেদে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে তাঁহার সাধনলব্ধ অনুভূতি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে তিনি যে গীতটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহার পর তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। তবে এ কথা এই স্থলেই পাঠকবর্গকে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, লেখক এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ; তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান একেবারেই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি যাহা বলিবেন তাহা কাঙ্গাল হরিনাথেরই কথা।

গানটী এই ;———

কে বলে এজগতে দুই আছে।
কেবলে চিন্ময় মানুষ একা,
জগৎ জুড়ে রয়েছে।

যেমন একটী পারাবার, জুড়ে আছে এ সংসার,
তা হ'তে জল যাচ্ছে, আবার মিশ্‌ছে তায় এসে ;—
তেমনি, তা হ'তে এই জগৎ হয়ে,
আবার তাঁতেই মিশে যেতেছে।
উদ্ভিদ্ চেতন অচেতন, গ্রহতারা অগণন,
পবন কিরণ আদি যত জগতে আছে ;
এরা, এক হয়ে যাইবে শেষে,
যেমন এক হোতে সব এসেছে।
কেবল মায়ায় ভুলিয়ে, পরমজ্ঞান হারায়ে,
আমার মন যে ভিন্ন ভিন্ন সকল দেখিছে ;
যে জন মায়াবন্ধন ছেদ করেছে
(জগৎ) আত্মময় সে দেখিছে।
ফকির ফিকিরচাঁদ বলে, ভেসে নয়নের জলে,
মায়াপাশ ছেদিতে আমার কি সাধ্য আছে ;—
আমায়, দীনদয়াল দয়া করে,
দিলে, আত্ম-জ্ঞান যাই বেঁচে।

ব্রহ্মাণ্ড বেদে কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়াছেন, এক সংখ্যা যেমন কোটী কোটী সংখ্যায় পরিণত হয়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই অনন্তরূপে আপনাকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সমুদায় রূপের যেমন অবয়ব আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও অবয়ব আছে, কিন্তু সীমা নাই। ব্রহ্ম যখন কোন অবয়ব-বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় ; বাস্তবিক তাহা অসীম ও অনন্ত। কেন না জগতের প্রত্যেক আধারে প্রত্যেক রূপের অবয়ব, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনন্ত ; তদ্রূপ ব্রহ্মের এক ধারে ঐ সমুদায় প্রবিষ্ট আছে বলিয়া তিনি রূপে ও অবয়বে অনন্ত।

এখন একবার নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান, ও বিবেকের সহিত সংযুক্ত পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ, অতি পরিষ্কাররূপে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, ব্রহ্মের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ না হয়, তখনই তিনি নির্গুণ ; কিন্তু নাস্তিকের "নাস্তি"র মত এই নির্গুণ যে কিছুই নহে, এরূপ মনে করিও না। মাকড়সা যেমন বিস্তৃত জাল গুটাইয়া উদরস্থ করে, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্ম তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডজাল গুটাইয়া আপনাতে লিপ্ত করেন। নিরাকার-সাকার, ভৌতিক-সাকার সূক্ষ্ম-স্থূল, যে কোন মহিমা বা গুণ ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তৎসমুদায়ই ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। কেবল ব্রহ্মের ইচ্ছা প্রকাশ থাকে না ; এই কারণে তৎসমুদায়েরও প্রকাশ বিস্তৃতি হয় না। অতএব ব্রহ্মে ইচ্ছা যখন প্রকাশ থাকে, তখনই তিনি নির্গুণ। নতুবা যিনি নির্গুণের অর্থ "কিছু নহে" মনে করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হন।

ব্রহ্ম স্ব-প্রকাশ অর্থাৎ তিনি আপনার ইচ্ছা আপনিই প্রকাশ করেন ; তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশের অন্য কারণ নাই। কারণ আর কোথায় থাকিবে ? সকল কারণের কারণ যে তাঁহাতেই লিপ্ত রহিয়াছে ; তিনি ভিন্ন তখন আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই কেন ? যে মায়ার নিমিত্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বোধ হয়, সেই মায়া যদি না থাকে, তাহা হইলে এখনও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই, পরেও আর কিছু থাকিবে না। ঐন্দ্র-জালিকের ঐন্দ্রজাল-ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে সে যেমন তেমনই থাকে, কেবল ক্রীড়াই থাকে না, সেইরূপ পরেও ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছু থাকে না।

এই নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আপনাকে বিস্তৃত করিতে অর্থাৎ তিনি এক ছিলেন, আপনাকে অসীম অনন্তরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন ; সেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণেরও প্রকাশ হয়। অতএব ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্গুণ সগুণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন তাঁহার ইচ্ছা

প্রকাশ হয় না, তখনই তিনি নির্গুণ; যখন ইচ্ছা প্রকাশ হয়, তখনই তিনি সগুণ। এস্থলে এ কথা বলিলে আরও সহজ হয়, ইচ্ছা অপ্রকাশের নাম নির্গুণ, আর ইচ্ছা প্রকাশের নামই সগুণ।

এই সগুণ আবার দুই প্রকার—নিরাকার ও সাকার। যখন কেবল ভাবময় জ্যোতির্মাত্র, তখনই নিরাকার; যখন সেই নিরাকার জ্যোতিঃ কোন অবয়ব-বিশিষ্ট হয়, তখনই নিরাকার-সাকার। সাধনসিদ্ধির সময় সাধনের ধন ভগবানচন্দ্র জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার-সাকাররূপেই সাধকের হৃদয়-মন্দিরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ঐ প্রকারে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বলিয়া থাকেন—"প্রাপ্তির ঘরে জ্যোতির্ম্ময়, মারা যায় যে এ নিরাকার" ইহা কেবল গ্রন্থলিখিত উপদেশ-বাক্য নহে, সাধকের আত্মপ্রত্যক্ষ ও সত্য।

অতএব সাকার আবার দুই প্রকার—নিরাকার-সাকার ও ভৌতিক-সাকার। নিরাকার-সাকারে যেমন অবয়ব-বিশিষ্ট, তদ্রূপ মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময় অসীম ও অনন্ত—কেবল আত্ম-প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা দেখা যায় না, কেবল আত্মাতেই তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে; এবং তাহার জন্ম মৃত্যু নাই—প্রকাশ অপ্রকাশ আছে। আবার ভৌতিক সাকারও অবয়ব-বিশিষ্ট; কিন্তু নিরাকার-সাকারের ন্যায় মুক্ত নহে। ইহা আবদ্ধ এবং ইহার জন্ম মৃত্যু আছে। অর্থাৎ নিরাকার সাকার যেমন ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও আপনাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে পারে, ভৌতিক-সাকার তাহা পারে না। শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি জন্তু যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরের ঘরস্বরূপ আবরণও চলে, তদ্রূপ ভৌতিক-সাকারের অবয়বরূপ ঘর অর্থাৎ শরীরও চলিয়া থাকে; এবং সে ইচ্ছা করিলে আপনাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে পারে না। প্রকাশ হইতে হইলে জন্ম এবং অপ্রকাশ

হইতে হইলে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নিরাকার-সাকার ও ভৌতিক-সাকারে এইরূপ অনেক পার্থক্য আছে।

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইবামাত্র অর্থাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র, অগ্রে নিরাকার-সাকারে আপনাকে বিস্তার করিয়া, পরে ভৌতিক-সাকারে বিস্তৃত হইয়াছেন। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার জগৎ বিদ্যমান আছে—আধ্যাত্মিক-জগৎ ও ভৌতিক-জগৎ। আধ্যাত্মিক-জগৎ অর্থাৎ যে জগৎ কেবল আত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। ভৌতিক-জগৎ অর্থাৎ যে জগৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়—আত্মা যতদিন ত্রিগুণ অর্থাৎ ভূতে আবদ্ধ থাকে, ততদিন ঐ প্রকারে দর্শন করে মুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়-দ্বারা ব্যতীতও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক জগৎ কেবল নির্গুণ ব্রহ্মার বিস্তৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং কি আধ্যাত্মিক, কি ভৌতিক-জগৎ, সকলই ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্মময়—এইরূপ জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান।

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে কাঙ্গাল হরিনাথকে কত কি করিতে হইয়াছিল, তাহার আভাস তাঁহার নিম্নলিখিত গীতটীতে স্পষ্ট পাওয়া যায় :———

"ও আমার জ্ঞান হোল না, ধ্যান হবে কি বল না।
তুমি, জগৎ মাঝে, জগৎ আছে
কোরে তোমার ধারণা।
তুমি আমার একা নও, বাহির অন্তরেতে রও,
জগৎ তোমার পুত্র-কন্যা, জগতের মা হও ;—
তোমার যত সন্তান সকল সমান,
আপন বৈ কেউ পর না।



তোমার জ্ঞান হ'লে মনে, তবে তোমার সন্তানে,
পর ভাবিত এমন কেবা আছে ভুবনে ;
আমার জ্ঞান হয় নাই, পর ভাবি তাই,
ভাই ভগিনীর দিই যন্ত্রণা।
তুমি জগতের মাত, যদি সে জ্ঞান হোত,
তবে কাঙ্গাল ধ্যানে তোমায় দেখিতে পেত ;—
কাঙ্গাল অজ্ঞান-ঘোরে ধ্যান কোরে,
অন্ধকার আর দেখ্ত না।"

উপরে যে প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইল, তাহা আরও বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার জন্য কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন "ব্রহ্মের ইচ্ছা অপ্রকাশের নাম যে নির্গুণ এবং ইচ্ছা প্রকাশের নামই যে সগুণ, ভৌতিক-জগতের প্রকৃতি আলোচনা করিলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকে শিশু সন্তানকে নির্গুণ বলে। তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য এই যে, শিশুদিগের ইচ্ছা আছে, কিন্তু তাহার বিকাশ নাই। এই জন্য যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা শিশুতে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্গুণ উপাসক, তাঁহারা গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। শিশুদিগের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে গুণের যতই বিকাশ হয়, তাহারা ততই যেমন সগুণ ; তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মের ইচ্ছা সহকারে গুণের যতই বিকাশ, তিনিও ততই সগুণ ! অতএব, নির্গুণই সগুণ, সগুণই নির্গুণ ; নিরাকারই সাকার, সাকারই নিরাকার। বালকবালিকার স্বভাব একবার আলোচনা করিয়া দেখ ; তাহাদিগের খেলিবার ইচ্ছা হইলেই আর আর বালক-বালিকাদিগকে ডাকিয়া একত্র হয় এবং সকলে মিলিয়া ইচ্ছামত খেলা করে। মাতা যদি নিষেধ করেন, "কোথায় গিয়ে কাজ নাই, ঘরে বসিয়া

একাকী খেলা কর" তাহারা মাতার ভয়ে এ, ও, তা লইয়া ঘরে বসিয়া ক্ষণেক খেলা করিলেও, আর তাহা ভাল লাগে না ; ছুটিয়া সঙ্গীদিগের নিকট যায়। ইহাতে বোধ হয়, একাকী খেলা করা সম্ভব নহে। বালক-জগৎ যে স্বভাব হইতে এই স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্বভাবের যে এই স্বভাব, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? অতএব, সেই স্বভাবে, ব্রহ্মের খেলিবার ইচ্ছা হইলেই জগতেরও প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ; তাঁহার ত আর দ্বিতীয় নাই। তিনি আর কাহার সহিত খেলা করিবেন? অতএব আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনাকেই প্রকাশ ও বিস্তার করিয়া আপনি খেলা করেন। তাঁহার এই খেলার নিমিত্তই আধ্যাত্মিক, ভৌতিক জগতের প্রকাশ হইয়াছে। যখন তাঁহার খেলিবার ইচ্ছা থাকিবে না, তখন এই জগৎও লয় প্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁহাতেই লীন হইবে। নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ হইবার কারণ অতি সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত, আমি বালকের স্বভাব দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া যে কথা বলিলাম, তপোনিধি মৈত্রেয় ভক্তপ্রধান বিদুরের প্রশ্নোত্তরে বিস্তাররূপে তাহাই বলিয়াছিলেন।"

অতঃপর আমরা ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া কাঙ্গালের বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। এবারে আর দুইটী গান দিয়াই এই প্রস্তাব শেষ করিব। ইহার একটী গান পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত, দ্বিতীয়টী কাঙ্গাল হরিনাথের গান। প্রফুল্লচন্দ্র কাঙ্গালের ভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা এই গানে বুঝিতে পারা যায়!

(১)

"এ আবার কিরূপ দেখি স্বরূপ মাখা অরূপীর গায়।
ও রূপ ধরে না ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
উথলিয়ে ভাসিয়ে যায়। (অরূপীর রূপ)

রূপটী ঠিক মদনমোহন, শ্যামা ব'লে ভুল যে হয়,

সকল অঙ্গে তারার অলঙ্কার শোভা পায় ;

আবার পিছনে ঠিক নবভানু-ছটা

আনি কে দিল হায়।

(শ্যামের মাথে)

কি চঞ্চল রূপখানি মার, থর থর কাঁপিছে হায়,

ধরি ধরি মনে করি ধরা না যায় ; (ও রূপ)

আবার, রাঙ্গা মাথা নূপুর পায়ে

রুণু রুণু নেচে বেড়ায়। (শ্যাম শ্যামা)

সম্বর ও রূপ মা, ক্ষুদ্র হৃদে আর ধরে না,

রূপে যে বিশ্ব অম্বর ভাসিয়ে যায় ;

বুঝ্‌লাম, এই জন্য আনন্দময়ী,

দিগম্বরী সাধকে কয়।

(অম্বর বেড়ে না পায়)

রূপে বিশ্ব ডুবে গেল, বল্ দেখি মা থাক্‌ব কোথায়,

রূপসাগরে ডুবে থাকা ভাল ত নয় ;

ফিকির, এই করে প্রার্থনা মা গো,

মাঝে মাঝে দেখাটী পায়।

(হৃদয় মাঝে, দিনে রেতে)

(২)

এ রসের রত্নাকরে, ভাস্‌লে পরে,

কখন রতন পাবে না।

সাগরে আছে রতন, মনের মতন

যতন বিনে তা মেলে না ;

ওরে মন ডুবে জলে, গিয়ে তলে,
পরশ-পাথর তুলে নে না।
ওরে মন ভাবাবেশে, বেড়াও ভেসে,
প্রেমরসে ডুবে দেখ না ;
ওরে সে পরশ রতন, পরশে মন,
অমনি রে তুই হবি সোণা।
কাঁদিয়ে কাঙ্গাল আকুল, সোলার পুতুল,
ডোবালেও এ মন ডোবে না ;
ওরে সে. আপন বশে, আপনি ভাসে,
মন যেন ঠিক টোপা পানা।

[৫]

ব্রহ্মাণ্ড বেদে—ব্রহ্মরূপ।

অমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি যে কথা এখন বলিতেছি, তাহা স্পষ্ট হইতেছে না, তাহা অনেক সময় পাঠযোগ্য হইতেছে না। ইহা আমার অপরাধ। আমি সামান্য অক্ষর-জ্ঞান-বিহীন হইয়া ব্রহ্মরূপের কথা বলিতে বসিয়াছিলাম। তবে আমার একটী কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা প্রায়ই কাঙ্গালের কথা, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদের কথা। তাহার মধ্যে যেখানে আমি নিজে দুই চারি কথা বলিতে গিয়াছি, সেই স্থানেই গোল বাধাইয়া ফেলিয়াছি, সেই স্থানেই বিষয়টী অস্পষ্ট হইয়াছে, অন্ধের হস্তী-দর্শনের মত হইয়াছে। সেই জন্য আমি এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে নিজের ভাষায় কোন কথা বলিব না, কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদে ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিব। তাহা হইলেই পাঠকগণ কাঙ্গালের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

ব্রহ্মরূপের আলোচনা উপলক্ষে কাঙ্গাল বলিয়াছেন—"মাতার নিষেধ বাক্যে বালকবালিকাগণ যেমন এ, ও, তা লইয়া ঘরে বসিয়া ক্ষণেক খেলা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও আপন ঘরে আপনি বসিয়া ক্ষণেক খেলা করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা-মাতা, তাঁহার ত আর পিতামাতা নাই; অতএব তিনি আপনি আপনাকে নিবৃত্ত করেন, অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা সংযত করেন। এরূপ নিবৃত্তির নামই মহাপ্রলয়। ইচ্ছাই আদ্যাশক্তি। এই

ইচ্ছাতেই ব্রহ্ম যখন রমণ ও ক্রীড়া করেন, তখনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। ব্রহ্মের ইচ্ছাকেই ব্রহ্মরস বলে। এই রসে ব্রহ্ম ক্রীড়া ও রমণ করেন বলিয়া সৃষ্টির আদি কারণ রাস হইয়াছে। ব্রহ্ম যখন ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা আপনাতে বিলীন রাখেন, তখনই নৌকাখণ্ড।

"ব্রহ্ম-রস আধ্যাত্মিক জগতে দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়। এক শ্যাম রূপে, অপর শুভ্র বা শিবরূপে। সকল বর্ণ যাহাতে প্রকাশ, সেই কৃষ্ণ-বর্ণ; আর সকল বর্ণ যাহাতে অপ্রকাশ ও লীনভাবে আছে সেই শুভ্রবর্ণ। অতএব কৃষ্ণ ও শিব, উভয় বর্ণেই ব্রহ্মরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মার ত্রিনেত্র দর্শনকেই আধ্যাত্মিক দৃশ্য বলে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত শ্রবণকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া থাকে। ভগবান যে, এইরূপে আপনাকে প্রদর্শন এবং আপনার আদেশ প্রচার করেন, তাহা সাধনহীন অবিশ্বাসীর ধারণা করিবার সাধ্য নাই। যাঁহারা সাধনশীল ও বিশ্বাসী, তাঁহাদিগের অনেকের আবার এই বিশ্বাস যে, ভগবান ব্রহ্মাকেই ঐ প্রকারে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটেই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন; ঐরূপ আর কোথাও হয় না ও হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহাকেই ঐ প্রকারে দর্শন দিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকটেই আদেশ প্রচার করেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।"

আর একস্থলে কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন—"ব্রহ্মেতে যখন ব্রহ্মাণ্ড বিলীন থাকে এবং ব্রহ্মের ইচ্ছার প্রকাশ থাকে না, তিনি তখনই নির্গুণ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি যখন নির্গুণ, তখন যে কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিবে? কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তবে তাহা আর কে অনুভব করিবে?

"ইঙ্গিত, শব্দ ও বাক্য দ্বারা যেমন হৃদয়ে কোন এক ভাবের সঞ্চার হয়, সেইরূপ রূপের দ্বারাও হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সঞ্চার হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রশান্তরূপে প্রশান্তভাব এবং রুদ্ররূপে ভয়ঙ্কর রুদ্রভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এই প্রকার হয় বলিয়াই তাহার নাম রূপ অর্থাৎ স্বরূপ অথবা স্বভাব হইয়াছে। এই রূপ দুই প্রকার,সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ রূপে ভৌতিক রূপ নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই ; অথচ নির্গুণ ভাবে সকলই আছে ; অর্থাৎ এ রূপ, গন্ধ, স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আত্মাতেই প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত ইহাকে আবার অধ্যাত্ম:রূপ বলে। এ রূপ-কল্পনা, যত্ন ও চেষ্টায় প্রকাশ পায় না। যখন পায়, তখন আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এই রূপকে স্বপ্রকাশ বলে। যখন এই রূপ আত্মাতে প্রকাশ পায়, তখন আত্মা দেখে, আঘ্রাণ করে এবং স্পর্শসুখে সুখী হয়। এ রূপের শেষ নাই, অতএব অনন্ত। যিনি না দেখিয়াছেন, বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে এ রূপের কথা বুঝাইবার উপায় নাই। অতএব, এ রূপ অনির্ব্বচনীয়। মন এ রূপ মনন করিতে পারে না ; এই নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"সগুণ রূপ অর্থাৎ গুণযুক্ত রূপ। এ রূপ চক্ষে দর্শন, নাসিকায় আঘ্রাণ এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ে স্পর্শ করা যায় ; সুতরাং বাক্য ইহা প্রকাশ করিতে এবং মনও মনন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই রূপের অন্তরে সেই নির্গুণ রূপ আছে। বস্তুতঃ, নির্গুণ সগুণ, সূক্ষ্ম স্থূল, সকলই ভগবান। নির্গুণ না থাকিলে সগুণের প্রকাশ হয় না। সেই নির্গুণের আভাস যখন আত্মাতে প্রতিভাত হয়, তখন আর পরিমিত সগুণ আত্মাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। আত্মা তখন, মলয় বায়ু পাইলে লোকে যেমন

তালবৃন্ত পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ সগুণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণে আত্মযোগ করিয়া থাকে। সগুণ ধ্বংসশীল এবং আত্মা যে পর্য্যন্ত ত্রিগুণ-যুক্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় অভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। নির্গুণ নিত্য এবং ইন্দ্রিয় ব্যতীতও প্রত্যক্ষ হয়। **দেবমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া পূজার্চ্চনা ও ধ্যান ধারণা করিবার যে রীতিপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা আর কিছুই নহে, নির্গুণ রূপের উদ্দীপনার্থ মানচিত্রের ন্যায় চিত্রাভাস মাত্র।** ভগবান যে সাধককে যে রূপে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং যে সাধক যে রূপে কৃতার্থ হইয়াছেন ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি তাহারই আভাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন; পরে গ্রন্থ দেখিয়া আবার কেহ তাহা মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। তন্ত্রের তান্ত্রিক রূপ ও মূর্ত্তিগুলি আলোচনা করিলেই আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বোধ হইবে। তান্ত্রিক রূপের ন্যায় আবার যান্ত্রিক রূপও আছে; যেমন শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতি। সত্যস্বরূপের কোন্ কোন্ সত্য উদ্দীপনের নিমিত্ত এই যন্ত্র অর্থাৎ উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার দুইটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

১। শিবলিঙ্গ—ইহা হরগৌরী অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতি-মিলিত যন্ত্র। এই যন্ত্র দ্বারা এই উদ্দীপন হয় যে, পুরুষ ও তাঁহার ইচ্ছাই ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশের কারণ। যখন পুরুষে ইচ্ছার সংযোগ হয়, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকে। পুরুষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন না; আপনার ইচ্ছা আপনি ধারণ করেন, রমণ করেন। পুরুষ ও ইচ্ছায় যুগল হইয়াই সৃষ্টির কার্য্য করিয়া থাকে। অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধ প্রকৃতিই সৃষ্টির নিদান। সাধারণ পুরুষে যেমন পুরুষত্ব এবং স্ত্রীতে স্ত্রীত্ব আছে; পুরুষে স্ত্রীত্ব ও স্ত্রীতে পুরুষত্ব নাই; এ যন্ত্র তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষ নহে। ইহাতে একাধারে পুরুষত্ব ও

স্ত্রীত্ব উভয়ই আছে। অর্থাৎ যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি; যিনি মাতা, তিনিই পিতা। এই প্রকৃতি-পুরুষ, মাতৃপিতৃস্বরূপাদি উদ্দীপন করিয়া ব্রহ্ম-সাধনই উক্ত যন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২। শালগ্রাম-শিলা—ইহা গোল; সুতরাং কোণযুক্ত না হওয়ায় শালগ্রামে ভগবানের আদিঅন্তশূন্যতার উদ্দীপন হয়। আদি-অন্তের কারণও সীমাবিশিষ্ট হস্তপদাদি। শালগ্রামে তাহা কিছুই নাই; অথচ শালগ্রাম অচল, আবার তাহাকে স্থানান্তরিতও করা যায়। অতএব ভগবান চলেন ও চলেন না, তদ্দ্বারা ইহারও উদ্দীপন হয়। শ্রুতিও সেই কথা বলিয়াছেন—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

"তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন।" ভগবান যেমন সূক্ষ্মরূপে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে রহিয়াছেন, বৃহত্তম পদার্থে আবার বৃহত্তমরূপে বিরাজ করিতেছেন। যিনি সূক্ষ্ম তিনিই স্থূল, ইত্যাদি ভগবানের নানা স্বরূপ উদ্দীপনই শালগ্রাম-শিলাযন্ত্রের উদ্দেশ্য। শালগ্রাম-শিলা দ্বারা কিরূপ ব্রহ্মভাবের উদ্দীপন হয়, তাহা শালগ্রামের স্নানার্থ যে শ্লোক পঠিত হইয়া থাকে, সেই শ্লোকটী আলোচনা করিয়া দেখিলেই, সকল বিষয়ের স্পষ্টানুভূতি হইবে। শ্লোকটী এই—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্রাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥"

যে পুরুষের সহস্র সহস্র মস্তক, যাঁহার সহস্র সহস্র চক্ষুঃ, যাঁহার সহস্র সহস্র পাদ, যিনি এই পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া অবস্থিতি

করিতেছেন, সেই পুরুষ আমার হৃদয়ে দশাঙ্গুল পরিমিত হইয়া অবস্থিতি করুন।”

এই স্থানে কাঙ্গালের একটী গান তুলিয়া দিয়াই আমি বর্ত্তমান প্রস্তাবের শেষ করিব। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদে যে সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাধনলব্ধ ধন; তিনি পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের জন্য কিছুই বলেন নাই, তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, সুতরাং পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁহার ছিল না;—তিনি যে কাঙ্গাল। সেই কাঙ্গালের সাধনলব্ধ কথাই ব্রহ্মাণ্ডবেদে লিখিত হইয়াছে এবং তাহাই আমি উপরে উদ্ধৃত করিলাম। একটী স্থান আমি বড় অক্ষরে দিয়াছি; কারণ কাঙ্গালের সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহার আভাস ঐ কথায় পাওয়া যায়। যদি পাঠকগণের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা গল্প কবিতা প্রভৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই মহত্তর ও কল্যাণপ্রদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাকার নিরাকার এবং আত্ম ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ কি কি কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। এইবার কাঙ্গালের একটী গান শুনুন। কাঙ্গালের কথাতেই অনেক বিষয় অনেকের নিকট স্পষ্ট হইয়া থাকে, কারণ তিনি যাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাণের আবেগে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; লিপি-কুশলতা বা পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না; তাই তাঁহার কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না—তাঁহার কথা অতি সরল। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার সেই সকল সাধনলব্ধ তত্ত্ব গানে প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিরক্ষর ব্যক্তি পর্য্যন্তও সকল কথা জলের মত বুঝিতে পারিতেন। সেই জন্যই আমি যখন তখনই কাঙ্গালের রচিত গান তুলিয়া দিয়াছি। আমার

মনে হয়, কাঙ্গাল তাঁহার গানের দ্বারাই দুরূহ তত্ত্ব সকল সর্ব্বজনবোধ্য করিয়াছেন। এই কারণেই আমি নিম্নে একটী গান লিপিবদ্ধ করিলাম এবং প্রায় সকল প্রস্তাবেই কাঙ্গালের গান সন্নিবেশিত করিয়াছি।

দেখ, আস্‌মান্ জুড়ে আজব পুরুষ এক জনা।
লোকে, যাহা হেরে, যাহা করে, সকলই তাঁর কারখানা।

১। আকাশ তাঁরে বেড়ে নাহি পায়,
তাই সে পুরুষ চিরকালই লেংঠা হ'য়ে রয় ;
সে ত সকল স্থলে, আস্‌মান্ জলে,
নিজে কিন্তু চলে না। (সকল চালায়)

২। সে পুরুষের সকলই আজব,
হাত বিনে সে গ্রহণ করে, কান নাই শোনে সব ;
সে ত বিনা চোখে সকল দেখে,
কেউ ত তারে দেখে না।

৩। পুরুষ যেমন রমণী তেমন,
তারা দুজনে মিলিয়ে করে জগত সৃজন ;
আবার স্ত্রী-পুরুষে যখন মেশে,
তখন কিছুই থাকে না। (এ ব্রহ্মাণ্ডের)

৪। কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
এদের স্ত্রী-পুরুষের দেখ রে ভাই, অনন্ত সকল ;
এদের খেলার মাঝে যে রস আছে,
কর রে ভাই ভাবনা।

[৬]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমি কয়েকটী কথা বড় বড় অক্ষরে দিয়াছি; তাহা হইতেই পাঠকগণ সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথের মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই কথাটা লইয়া আবহমানকাল হইতেই তর্ক চলিয়া আসিতেছে; এ সম্বন্ধে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নানা মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবে সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ আরও যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রদান করা আমি কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি।

'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এক স্থানে এই সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কাঙ্গালের একটী কথা আমি বলিয়াছি; এখানে সেই কথাটা পুনরায় বলিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি একদিন কাঙ্গাল হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা দাদা, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" কাঙ্গাল আমার কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমরা বানান জানি না সেজন্য গোল করি। তিনি বলিয়াছিলেন প্রথমে বানান করিতে হইবে 'নীরাকার' অর্থাৎ জলের মত আকার। জল যেমন যে পাত্রে থাকে, তখন সেই প্রকার তাহার আকার হয়; ঈশ্বরও তেমনই; যেমন পাত্রে থাকেন, তাঁহার তেমনই আকার হয়। তাহার পর এই 'নীরাকার' 'নীরাকার' বলিতে বলিতে—ঐ কথা সাধন করিতে করিতে শেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'নীরাকারের'

দীর্ঘ-ঈকার কেমন করিয়া হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে ;—তখন হইয়াছে 'নিরাকার।' তাহার পর ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায় যে দীর্ঘ হ্রস্ব সব চলিয়া গিয়াছে ;—তখন হইয়াছে 'নরাকার'। এমন সুন্দর কথা কি আর হয় !

এক্ষণে সাকার ও নিরাকার সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডবেদ কি বলিতেছেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাহার মুখবন্ধ বা বিবৃতি স্বরূপ আমি কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের একটি গান তুলিয়া দিতেছি। এইটি পাঠ করিলেই আসল তত্ত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমি আশা করি। গানটী এই—

"কর এক ভজনা।
ওরে, ভব-ভাবনা রবে না ;—
এক আর এক করলে যোগ,
গোলযোগ বৃদ্ধি হবে, পার পাবে না।
একে এক যোগ দুয়ের কথা,
দুই হ'লে হয় সাধন কোথা,
তবে রে যোগ ক'রে বৃথা, গোলযোগ কর রচনা।
একের মহিমা অসীমা, করিতে তাহার সীমা,
প্রতি গুণে করলে কত প্রতিমা রচনা ;—
শেষে, অনন্তের না পেয়ে অন্ত,
ক্ষান্ত হ'ল যত ভ্রান্ত,
তাই বলি অনন্তের অন্ত করিতে নারে কল্পনা ;—
ভেবে একবার দেখ সবাই,
অনন্ত এক, তার অন্ত নাই,
দীন হীনের নিবেদন তাই, ছাড় ছাড় রে কল্পনা।

নিরাকার ও সাকার সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রহ্মাণ্ডবেদে বলিতেছেন যে, জলের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই; সুতরাং জল সগুণ হইলেও এক প্রকার নিরাকার। কারণ, যেমন আধারে রাখ, জল সেইরূপ আকার-বিশিষ্ট হয়। জলের ন্যায় নিরাকারও সাধকের হৃদয়ানুসারে নানা আকার ধারণ করে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট আকার-বিশিষ্ট নহে, এই নিমিত্ত আধ্যাত্ম নির্গুণ-রূপকে নিরাকার বলে। জলের সহিত ঐ আকারের পার্থক্য এই যে, জলে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বাদস্পর্শাদি আছে, এ আকারে তদ্রূপ কিছু নাই। অথচ, যাহা আছে, তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, কেবল আত্মার গ্রাহ্য। নিরাকার-রূপ অনন্ত এবং আকাশের ন্যায় অসীম। সাধক অর্থাৎ আত্মা পঞ্চভূতে আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যনাম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার হৃদয়-আকাশ ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনন্তদেবের অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব কিরূপে ধারণা করিবে? এই নিমিত্ত হৃদয়ের বিস্তৃতি অনুসারে ভগবানেরও প্রকাশ হইয়া থাকে। শালগ্রামের স্নানার্থ মন্ত্রে "তুমি দশাঙ্গুলি পরিমিত হও" যে উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যের হৃদয়-স্থান দশাঙ্গুলি পরিমাণের অধিক বিস্তৃত নহে। সুতরাং সাধক দশাঙ্গুলি পরিমিত প্রার্থনা করিয়াছেন।

তার্কিকগণ এ স্থলে তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, ভগবান যদি এইরূপে সীমাবদ্ধ ও পরিমিত আকার-বিশিষ্ট হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার অখণ্ডত্ব ও অনন্তত্ব নষ্ট হইল। আমি বলিতেছি, নষ্ট না হইয়া বরং তাহার আধিক্যই হইল। তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট হৃদ্বোধ হইতে পারে। জলে বুদ্বুদ উঠিতেছে; তাহাতে কি জলের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে? আবার জলবিম্ব যেমন জলেই মিশাইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানও সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আবার আপনার অনন্ত ও অখণ্ড স্বরূপে মিশাইয়া যান।

ইহা তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচায়ক; এবং তাঁহার আবির্ভাব ও প্রকাশেরও অর্থ এই। তিনি ত সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান্ আছেন, তিনি না থাকিলে কিছুই থাকে না। তবে তাঁহার আবার প্রকাশ কি? এ স্থলেও অবিশ্বাসী তার্কিকগণ আবার এরূপ কুতর্ক উপস্থিতও করিতে পারেন যে, যে পরিমাণে জলের বুদ্বুদ উঠিয়া থাকে, সেই পরিমাণে জলের হ্রাস হয়, আবার বুদ্বুদ তাহাতে মিশিলে সেই পরিমাণে তদ্রূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ইহা অদৃশ্য হইলেও স্বতঃসিদ্ধ, অনুমান-প্রত্যক্ষ। অতএব এই দৃষ্টান্তে হৃদয়ে প্রকাশিত ভগবানের অনন্তত্ব ও অখণ্ডত্ব যে অব্যাহত থাকে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমি এই তার্কিকগণের সংশয়চ্ছেদের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছি, আকাশশূন্য কোন পদার্থ নাই। আকাশ ঘটে, মন্দিরে এবং জীবের শরীরে নানা স্থানে নানা ভাবে নানা আয়তন—পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার যেমন অসীমত্ব ও অখণ্ডত্ব নষ্ট হয় না, তদ্রূপ হৃদয়ের আয়তনানুসারে প্রকাশিত হইলে ভগবানেরও অখণ্ডত্ব ও অনন্তত্ব নষ্ট হয় না। আরও দেখ, বাহ্যবস্তু মাত্রেই অগ্নি আছে। কিন্তু সর্ব্বদাই কি সকল পদার্থে অগ্নির প্রকাশ হইয়া থাকে? যখন প্রকাশ পায়, তখনই যেমন অগ্নির প্রকাশ বলে; তদ্রূপ যখনই ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার প্রকাশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবস্তু হইতে অগ্নির উদ্দীপন করা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবানের প্রকাশ প্রক্রিয়া দ্বারা হয় না। তাহা হইলে লোকে আর বাহ্য-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক হইত না; বৈজ্ঞানিকগণ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ দেখাইয়া দিতেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশিত হইবার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানও আছে।

সাধন ও জপ তপাদি ভগবানের প্রকাশের কারণ নহে, হৃদয়-বিশুদ্ধ-

তার কারণ। জপতপে হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে ভগবান আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে স্ব-প্রকাশ বলে।

এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ, উল্লিখিত প্রকারে ভগবানের স্ব-প্রকাশ-তত্ত্বই নিরাকার ও সাকার। কোন আকারের নির্দ্দিষ্ট নাই; সাধকের হৃদয়ে ভাব, উল্লাস ও প্রার্থনা প্রভৃতি অনুসারে কত রূপের যে প্রকাশ হইতেছে তাহার অন্ত নাই। অন্ত নাই বলিয়াই তিনি অনন্তরূপ। এই নিমিত্ত ভগবানকে নিরাকার বলে; স্ব-প্রকাশতত্ত্বে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম সাকার।

তাহার পর কাঙ্গাল বলিতেছেন—

"ভাইরে, সাদা চোখে দেখা যায় না, তাঁরে দেখিলে;
ও সে, পাগল-করা, দেয় না ধরা,
পানে পাগল না হ'লে। (নামের সুরা)
নামের সুরা পানে পা টলে,
রক্তবরণ নয়নতারা উঠে কপালে;—
সে যে, নেচে নেচে প্রেম যাচে,
পতিত হয় ভূতলে। (ভাবাবেশে)
কভু হাসে পাগলের মত,
কাঁদে, আবার নয়ন-ধারা বয় অবিরত;—
ও সে, আবোল তাবোল বলে কি বোল,
হরিবোল বলিলে।
কাঙ্গাল বলে, পাগলের সে ধন,
পাগল বিনে তাঁরে কেহ না পাবে কখন;—
জ্ঞান অভিমানী এমন মনই,
টলে না নাম শুনিলে। (পাগল হয় না)

সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া বলিতে গেলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে; তাই আমি কাঙ্গালের দুই একটী গানের দ্বারাই কথাটা বুঝাই-বার চেষ্টা করিয়াছি। কাঙ্গাল ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আত্ম ও সাধনতত্ত্বের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আত্ম ও সাধনতত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রধান তত্ত্ব।

কিন্তু সাধনার কথা মনে হইলেই আমার একটী গান মনে হয়। এ গানটী কাঙ্গালের রচিত নহে, কিন্তু কাঙ্গালেরই একজনের রচিত। তিনি ৺ পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। আমি শিবচন্দ্রের সেই গানটী এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গানটি এই—

বল্ মা, কিসে হয় সাধনা।
তোমার তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র যত, অন্তর্যাগের উদ্দীপনা।

১। প্রাণে প্রাণে জাগ্‌লে তুমি, প্রাণ যে তখন আর মানে না;
তখন মায়ের কোলে নাচে ছেলে, মায়ে পোয়ে এক ভাবনা।

২। কোথায় থাকে ভূতশুদ্ধি, ষট্‌চক্রভেদ ধ্যান ধারণা;
তখন তুমিই বল ওরে ও ভূত! ভূতের শুদ্ধি আর করিস্ না।

৩। কোন্ চক্র ছাড়িয়া তোমার, কোন্ চক্রে উঠাব গো মা;
তুমি সকল চক্রের চক্রেশ্বরী, ষট্‌চক্র ভেদ আর ঘটে না।

৪। দু এক দণ্ডের ধ্যান ধারণায়, মন বলে হায় কি যন্ত্রণা;
আমি, মার ছেলে মার কাছে থাক্‌ব, তাতেও আবার আনাগোনা।

৫। আমার, সন্ধ্যা পূজা পুরশ্চরণ হ'য়েও বুঝি হ'লো না মা;
তুমি, কিছু কর্‌তে দেও না, তবু না কর্‌লেও ত বিড়ম্বনা।

৬। লোকে বলে, দয়াময়ি! দয়া ক'রে হও প্রসন্না;
আমি বলি দয়া ক'রে বিরক্ত হও, এই প্রার্থনা।

৭। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কাজ মা! গড়ছ ভাঙ্গছ কতখানা;
তোমার এক নিমিষের অবসর নাই, তাই বলি এক সুমন্ত্রণা।

৮। এই অশান্ত সন্তান শিবকে, কোলে ক'রে ঘুম পাড়াও না;
তোমার বাপের দিব্য, উঠে গেলে তখন আমি কাঁদিব না।

[৭]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—জ্ঞানের ব্যভিচার।

যোগতত্ত্ব ও জ্ঞানের ব্যভিচার সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' যাহা বলিয়াছেন, এখন আমি তাহারই উল্লেখ করিব। বিষয় গুরুতর, বিশেষতঃ গুরু-কৃপা না হইলে তাহার ব্যাখ্যাও অসম্ভব। তাহা জানিয়া শুনিয়াও কথাগুলি বলিতে হইতেছে। তবে কাঙ্গাল এই সকল কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, আমি শুকপক্ষীর হরিনাম কীর্ত্তনের মত তাহাই বলিয়া যাইব। যাহা তত্ত্ব তাহা কাঙ্গাল হরিনাথের, আর যাহা সুধুই বাক্য, সুতরাং অন্তঃসারশূন্য, তাহা সম্পূর্ণ আমার।

কাঙ্গাল বলিয়াছেন, কেবল প্রণিধান মাত্র আশ্রয় করিয়া ধারণা ধ্যান ও শ্রবণ মনন কীর্ত্তনে যোগতত্ত্বে, ও যোগতত্ত্ব হইতে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ এবং সমাধিলাভ করিতে পারেন, এরূপ সাধক অতি বিরল। পূর্ব্বজন্মের সাধন না থাকিলে, এরূপ অনায়াসসাধ্য সমাধি কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। তন্নিমিত্ত যোগসাধনের কতকগুলি উপায় যেমন অবধারিত হইয়াছে, তদ্রূপ ভক্তিসাধনেরও অনেক আলম্ব্য আছে। সিদ্ধযোগিগণ যোগমাহাত্ম্যে ত্রিনয়নে যাহা দেখিয়া থাকেন, ভক্তিপ্রভাবে ভক্তগণ যাহা অবলোকন করেন, সাধারণেরও অর্থাৎ ত্রিনয়নহীন জ্ঞানীর তাহা জানিবার ও বুঝিবার সাধ্য নাই। যোগী ও ভক্তগণ সাধারণ অর্থাৎ অযোগী ও অভক্ত জ্ঞানিদিগকেও ভক্তির ফল বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং উভয় তত্ত্বে তাঁহাদিগের বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত

অধ্যাত্মদর্শনের কতকগুলি তত্ত্ব পৃথিবী প্রদর্শনের মানচিত্রস্বরূপ বাক্যে, চিত্রে ও প্রস্তরফলকে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যোগ ও ভক্তি সাধনের কতক উপায় বাহ্যবস্তুর দ্বারাও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মানচিত্র-স্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে ঐ সমুদয় দৃশ্য এবং যোগ-সাধনের যন্ত্রগুলিকে যোগ ও ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ জ্ঞানিগণ পৌত্তলিকতা মনে করিয়া যে সকল নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছেন, এবং ঐ সকলের প্রতি এখনও ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগী ও ভক্তদিগের হৃদয়ে যে প্রকারে আঘাত করেন, তন্নিমিত্ত যে বিবাদ, বিসংবাদ ও ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর অকল্যাণ সাধিত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। মনুষ্যগণ যে, বিবাদ বিসংবাদ ও ভ্রাতৃবিরোধ করিয়া থাকে, এবং তাহার ফলস্বরূপ অমঙ্গল ভোগ করে, তাহাও জ্ঞানের ব্যভিচার।

শ্রীমান্ হনুমান, শ্রীমৎ উদ্ধব যে দাস্যভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ মহম্মদও সেই দাস্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। হনূমান যোগতত্ত্ব শিক্ষা ও সমাধি অবলম্বন করিয়া পরিশেষে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করেন। তিনি যে যোগতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই মুক্তিকোপনিষৎ, এবং মহানাটকই তদীয় ভক্তিতত্ত্বের পরিচায়ক। উদ্ধব যে যোগ ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা ও সাধন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহম্মদ যখন ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তখন তিনি যোগশাস্ত্র অবলম্বন করুন আর না করুন, যোগতত্ত্ব যে সাধন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ সমাধি ব্যতীত কেহই ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিতে পারেন না। সমাধি আবার যোগের শেষ অবস্থা। তিনি যোগতত্ত্ব হইতে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না, আমরা এরূপ কোন দৃষ্টান্ত অবগত নহি। কিন্তু তিনি যখন ঈশ্বরভক্ত, তখন তিনি ভক্তিতত্ত্বসাধন নিশ্চয়ই

করিয়াছিলেন। তবে ভক্তিতত্ত্বের বাহ্যোপায় অবলম্বন করেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাঁহার শিষ্যগণ দুর্জ্ঞেয়তা হেতু এবং বাহ্যোপায় অভাবে: যোগ ও ভক্তিতত্ত্ব হইতে ক্রমে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন।

নুরনবী হজরৎ মহম্মদের পরে মুসলমানকুলে আর কোন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেহ পাছে এরূপ মনে করেন, এই আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি যে, হজরৎ মহম্মদের পর অনেক ভক্ত মুসলমানকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত ফকীরের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ফকিরদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দুঋষিগণের ন্যায় প্রাণায়ামাদি বাহ্যোপায় অবলম্বন করিয়া যোগ ও ভক্তিসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং এখনও হইয়া থাকেন। যাঁহারা সাধন না করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যোগ ও ভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এবং হইয়া থাকেন। মুসলমান ফকীরদিগের মধ্যে যে সকল সিদ্ধযোগী এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান যোগিগণের উৎসবাদিতে সূক্ষ্মশরীরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। মুসলমান যোগীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভৌতিক দেহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা সাধন হিন্দুযোগতত্ত্বেরই অনুরূপ। বাস্তবিক ভেদজ্ঞানী অজ্ঞ লোকেরাই বেদ ও কোরাণ ভিন্ন মনে করিয়া ভ্রাতৃবিরোধের কারণ হইয়া থাকেন। মহর্ষি নানক বলিয়াছেন—

"বদ কেতব দুই ফরতা ভাই,
দিল্‌কা ফিকির না চাই।
টুক দম করারী জো করে
হাজির হুজুর খোদাই।"

"বেদ কোরাণ দর্পণের মত দুই ভাই, তদ্দ্বারা অন্তরের চিন্তা দূর হয় না। ক্ষণমাত্র যে বিশ্বাস করে, তাহার সম্মুখে তখনই ঈশ্বর উপস্থিত হন।"

এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে কাঙ্গাল হরিনাথ পুনরায় বলিতেছেন—যোগ ও ভক্তিতত্ত্ব ব্যতীত প্রণিধান জ্ঞান ক্রমে শুষ্ক ও কঠিন হইয়া আবদ্ধ হয়। জ্ঞান আবদ্ধ হইলে, বদ্ধ জলের ন্যায় রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে দুষ্ট হইতে থাকে। দুষ্ট জ্ঞানই অজ্ঞানতার কারণ এবং অজ্ঞানতাই ব্যভিচারের গর্ভ-ধারিণী। আবার যোগ ও ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরানন্দ লাভ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। ঈশ্বরানন্দের অভাব হইলে লোকে বাহ্যৈশ্বর্য্যসুখই আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহার হেতু স্বরূপ অর্থের উপার্জ্জন করিতে হিতা-হিত জ্ঞানশূন্য হয়। এই সকল কারণে জ্ঞানের যে ব্যভিচার ঘটে, তাহাতে পৃথিবী কতদূর প্রপীড়িতা ও মনুষ্যরক্তে দূষিতা হইয়াছে, পৌত্তলিকতা নিবারণার্থ মুসলমান ও খৃষ্টান এবং মুসলমান ও হিন্দুতে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। এই সকল কারণে যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, কত শতাব্দী পর কত শতাব্দী গত হইল, কিন্তু এখনও সেই বিরোধ বিদূরিত হইল না। ব্যভি-চার জন্য উক্ত বিরোধ হিন্দু ও মুসলমানকে কোথায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহা চিন্তা ও আলোচনা করিলে অভেদজ্ঞানী হিন্দু ও মুসলমান মাত্রই নেত্র-নীরে বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন,—জাতি-ভেদ জন্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দ্বেষাদি উক্ত ভ্রাতৃবিরোধের কারণ; কিন্তু আমরা জ্ঞানের ব্যভিচারই তাহার নিদান বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। কারণ, হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ ও পরমার্থতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায়, জাতিভেদ এক্ষণে যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূল তদ্রূপ ছিল না। শুদ্ধাচারী ঈশ্বর-ভক্তগণ ভ্রষ্টাচারী অভক্তগণের সহিত মিশি-তেন না—জাতিভেদের মূলে কেবল এইমাত্র ছিল; কিন্তু ইঁহারা কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। হিন্দুশাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও উদ্দেশ্য এখনকার ন্যায় পরমার্থবিরোধী

নহে; বরং সুমহৎ ছিল। পৃথিবীর দ্বীপ দ্বীপান্তরে যে কারণে বর্ণাশ্রম-নিয়ম রূপান্তরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভারতের বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য সেইরূপ ছিল। জ্ঞানের ব্যভিচার জন্য ভ্রাতৃবিরোধ হইতে উক্ত বর্ণাশ্রমপদ্ধতিও বিকৃত হইয়া পরিশেষে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এ কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, ভগবান মনুষ্যমাত্রেরই পিতামাতা; তথাচ যে ব্যভিচার জন্য অজ্ঞান, ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত করিয়া পৃথিবীর শান্তি হরণ পূর্ব্বক পরমানন্দের পরিবর্ত্তে তাহাতে নিরানন্দ ও শোকসন্তাপ বিস্তার করিতেছে, ইহা নিবারণ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ইহা নিবারণ করিতে হইলেই ভ্রাতৃবিরোধের মূল অর্থাৎ প্রণিধান-জ্ঞান যে স্থলে বদ্ধ হইয়া দুষ্ট হইয়াছে, সেই স্থানে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রণিধান-জ্ঞানের রুদ্ধ মুখ পরিষ্কার করিয়া যোগতত্ত্বে মিশাইয়া দিতে হইবে। ভক্তি ভগবচ্চন্দ্রের খাসভাণ্ডারের অমৃত। এই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে যিনি প্রবেশ করেন, তিনি জগন্ময় ব্রহ্মলীলা অবলোকন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকটে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই ভক্ত, একমাত্র ভগবানই ভক্তিপাত্র; সুতরাং ভক্তি-যোগে কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি দ্বেষের নাম গন্ধ মাত্রও নাই। অধিক কি, ভক্তগণ ইতর জন্তুতেও ভগবানের লীলা অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতিও স্নেহ করিয়া থাকেন। ভক্তি যে হৃদয়ে বাস করে, সে হৃদয় নবনীত অপেক্ষাও সুকোমল। অতএব আমি হিন্দু, আমি মুসলমান এবং আমি খৃষ্টান, ইহা বিস্মৃত হইয়া যাহাতে ভক্তিরসামৃত পান করিয়া পৃথিবীবাসী মনুষ্যমাত্রেই সুকোমলহৃদয় ভক্ত হইতে পারেন, প্রতি মনুষ্যেরই কায়মনোবাক্যে তদ্রূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য; এবং এইরূপ কর্ত্তব্যই ঈশ্বরের প্রীতি, প্রিয়কার্য্য ও পরমার্থ-প্রচার। আমি ব্রাহ্মণ এবং অমুক নীচজাতি, ইত্যাদি ভেদজ্ঞানরূপ অহঙ্কার ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

এই ভক্তিসাধন সুধু মুখের কথা নয়। তাই কাঙ্গাল গাহিয়াছেন—

"ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হ'তে যার ইচ্ছা, তার আগে শাক্ত হ'তে হয়।
শাক্ত হইলে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ;
মান, অপমান, বলিদান দিয়ে কর রিপুজয়।
রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি;
সিদ্ধি না হ'লে জ্ঞানবলে, অ আ ই ঈ করতে হয়।
সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ;
বিবেকী যখন হবে মন, তখন রে ভক্তির উদয়।
কাঙ্গাল বলিছে, ভক্ত হয় যখন, ওরে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন;
যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়।"

এই প্রসঙ্গে কাঙ্গাল হরিনাথের আর একটী গানের কথা স্মরণ হইল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব। গানটী এই—

"সেই প্রেমরতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম লাগি, বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়।
যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই, মুখে হরি ব'লে সুখী শুক গোঁসাই;
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে, বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।
ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম অভিলাষী, মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী;
যে প্রেম লাগিয়ে, ভাবিয়ে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়।
যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ, রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব প্রমাদ;
ছেড়ে অতুল ধন পরিজন লালা বাবু ফকির হয়।
শঙ্কর আচার্য্য, নানক, তুলসীদাস, যে প্রেম-মহিমা করেন প্রকাশ;
যে প্রেম-মহিমায়, রামমোহন রায়, এ বাঙ্গালায় হলেন উদয়।

দবির আর কবীর দুটী ভাই ছিল, তারা সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'ল ;
পাদসা এব্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকির হয়।
কাঙ্গাল বলিছে, এ প্রেম যার আছে, ওরে সীসা সোণা সমান তার কাছে ;
বিষয় অহঙ্কার, নাইরে তার, মান অপমান সমান হয়।"

[৮]

ব্রহ্মাণ্ড বেদে—Light, light—more light

আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি কাঙ্গাল হরিনাথের ব্রহ্মাণ্ড-বেদের কথা ভাল করিয়া দূরে থাকুক, মোটেই বলিতে পারিতেছি না। বিনা সম্বলে যে এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে নাই, তাহা আমি জানিতাম; আমি যে সম্বলহীন সে কথাও আমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু আমার একটা ছোট কৈফিয়ৎ আছে। একটি ইংরাজী প্রবচন আছে Fools rush in where angels fear to tread অর্থাৎ যেখানে মহামনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও পদক্ষেপ করিতে ভীত হন, মূর্খেরা সেখানেও সগর্ব্বে অগ্রসর হয়। আমার পক্ষে এ কথাটি বড়ই খাটে। ব্রহ্মাণ্ডবেদের পরিচয় দিবার যাঁহারা উপযুক্ত, অন্ততঃ যাঁহাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি, তাঁহারা কেহই এতদিন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ইহা যে বড়ই দুঃখের বিষয়, সে সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমি দেখিলাম কাঙ্গালের দেহত্যাগের পর এত দিনের মধ্যে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ কেহই তাঁহার কথা বলিতে বা তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন না। তখন আমি আমার অযোগ্যতা বিস্মৃত হইয়া কাঙ্গালের কথা বলিতে আসিলাম। আমার প্রকাশিত "কাঙ্গাল হরিনাথ" নামক পুস্তকের প্রথমভাগে আমি স্পষ্টই বলিয়াছি, আমি ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীতের ভিতর দিয়া কাঙ্গালকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম; তাই আমি "কাঙ্গাল হরিনাথ" গ্রন্থে কেবল গানের দ্বারাই তাঁহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু বাউলের গান বা অন্যান্য সঙ্গীতই ত কাঙ্গালের পরিচয় প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাঁহার গ্রামবার্ত্তা-সম্পাদকের মূর্ত্তি ও তাঁহার শিক্ষকের মূর্ত্তি, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদের গভীর তত্ত্বকথা, একত্র না বলিলে যে, তাঁহার সকল দিক বলা হয় না। তাই অতি অযোগ্য হইয়াও আমি তাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' কথা বলিতে বসিয়াছি। যে কথা, যে তত্ত্ব তিনি বহু সাধনায় লাভ করিয়াছিলেন, আমি এমন কি সৌভাগ্যবান্ যে, সেই সকল তত্ত্বকথা জলের মত সকলকে বুঝাইয়া দিব। সাধন নাই, ভজন নাই, অথচ গভীর তত্ত্বালোচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তাই আমার এই বিড়ম্বনা। সব দিকে মেকি চলে, কিন্তু এ পথে মেকি চলে না, এদিকে সব খাঁটি। মেকি এখানে একেবারেই মাটি। সেই জন্যই আমি 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই লোকের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে না; লাভের মধ্যে আমি ঘোর অপরাধগ্রস্ত হইতেছি। নিজের শক্তিসামর্থ্য না বুঝিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার ফল যাহা হয়, আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এই বিপদে পড়িয়া যখন তখনই কাঙ্গালের একটী গান আমার মনে পড়ে। সেই গানটি আমি উদ্ধৃত করিলাম।

গানটি এই—

"ওরে, মোর মনেরই মন, বোঝে না মন,
এমনই রে তার বুদ্ধি কাঁচা।
মন আমার ভবের মুটে, বেড়ায় ছুটে,
নাহি জোঠে পানি-গামছা;
মন আমার শাল রুমালের তত্ত্ব ক'রে,
মরছে ঘুরে, হচ্চে রাজা।

কাপড় যে হাতে খাটো, বহর আঁটো,
মন দিতে চায় লম্বা কোঁচা ;
ময়ূরের নৃত্য দেখে মনের সুখে,
প্যাকম্ ধরতে চায় রে পেঁচা।
মন আমার অহঙ্কারে মর্‌ছে ঘুরে,
মাথায় ক'রে জ্ঞানের বোঝা ;
ওরে, এই আকাশ যাঁরে ধর্‌তে নারে,
তাঁর আকাশে দিচ্ছে খোঁচা।
কাঙ্গাল কয়, যে জন যত বোঝে, তত
ব'য়ে মরে ভূতের বোঝা ;
এত বোঝাপড়ায় কাজ নাই রে মন,
বোঝ সোজা, চল সোজা।"

আমার অবস্থাও তাহাই হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার শেষ উপদেশ 'বোঝ সোজা, চল সোজা'—তাহা যে গ্রহণ করিতে পারি না। কিছুই সোজা বুঝিব না ;—সোজা পথে একেবারেই চলিব না। তাই এত যন্ত্রণা!

সে কথা থাকুক। এখন উপায় কি? পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধু বলিতেছেন "যৎ ভবিতব্যং তৎ ভবিষ্যতি"—আরম্ভ যখন করিয়াছ, তখন অগ্রসর হও। কেবল একমনে কাঙ্গালের নিকট কাঙ্গালভাবে প্রার্থনা কর "Light, light—more light আলো—আলো—আরও আলো!"

তাহাই হউক ; যিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, তিনি যেখানে লইয়া যাইবেন, সেখানেই যাইব ; আর শুধু বলিব "Light, light—more light, আলো আলো—আরও আলো!"

একটা কথা এখানে বলিতে চাই। আমি শাস্ত্রগ্রন্থ তেমন একটা পড়ি নাই ; যাহা সামান্য পড়িয়াছি, তাহাও না পড়ারই মত। ইহার কারণ

কি জানেন? পুজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋজুপাঠে একটা শ্লোক পড়িয়াছিলাম—

"ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণম্।
নবাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে,
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।"

শ্লোকটির সোজাসুজি অর্থ বোধ হয় এই দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি দুরাত্মা তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলেও কিছু হয় না, বেদাধ্যয়নেও কোন ফল হয় না; তাহার যা স্বভাব তাহা সহজে যায় না। সে কেমন? যেমন গরু স্বভাব-বশেই মধুর দুগ্ধ দান করে, এ দিকে তাহার আহার কিন্তু তৃণ। ঐ কথাটা আমার বড়ই মনে লাগিয়াছিল। আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, হৃদয়ের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য; তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা লইয়া পড়িতে বসিলে কি হয়? মুখে পড়ি, কিন্তু মন থাকে আর এক নীচ প্রসঙ্গে মত্ত। এই কথা ভাবিয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "শকুনি ওঠে বহুদূর আকাশে, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের মড়ার দিকে" আমাদেরও অনেক সময়ে সেই দশা হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে রুচি হয় না—পড়িতে বসিলেও পড়ার মত পড়া হয় না। তাই কাঙ্গালের এই যে সুন্দর ব্রহ্মাণ্ডবেদ, তাহা এতকালের মধ্যে আমি ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই; সে দিকে মনই যায় নাই। এখন "কাঙ্গাল হরিনাথ" লিখিতে বসিয়া 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' পড়িতে হইতেছে। কিন্তু সব অন্ধকার! তাই বন্ধুর উপদেশ অনুসারে প্রতি পদক্ষেপে বলিতে হইতেছে "Light, light,—more light; আলো, আলো—আরও আলো!"

একদিন খেয়ালের বশে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এই যে সকলে

বলে পুরুষ—প্রকৃতি, শিব,—শক্তি, কৃষ্ণ—রাধা, এ সকলের প্রকৃত স্বরূপ কি ? নিজের অবস্থা ত—

"সে সব ভাব্‌তে গেলে মাথা ঘোরে,
ভাবনা শেষে ভাব না পায়।"

মনে করিলাম কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' খানি খুঁজিয়া দেখি। সেখানে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কিন্তু তখন হাতের কাছে, ব্রহ্মাণ্ড-বেদ, পুস্তকখানি ছিল না। হাতের কাছেই ছিল মনস্বী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের "The Soul of India" বা 'ভারতের আত্মা' নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকখানি। আমি সেই পুস্তকের যে পাতা-খানি হঠাৎ খুলিয়া ফেলিলাম, সেই স্থানেই দেখি পুরুষ— প্রকৃতি, শিব—শক্তি, কৃষ্ণ—রাধার কথা। বিপিন বাবু লিখিয়াছেন—

"The Sankhya doctrine of Prakriti, The Vedantic doctrine of Maya, The Vaisnavic conception of Radha, the Saivaite conception of Sakti,—all these represent the self-same attempt of the human mind and spirit to reach and realise the mystery of Divine Being."

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু ঐ পুস্তকের আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

"Maya is, thus, the explanation of our rational experience, Radha of our emotional experience; and Sakti of our volitional experience."

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু অতি অল্প কথার মধ্যে সব বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তখন ইচ্ছা হইল কাঙ্গাল হরিনাথ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখিতেই হইবে। স্থানান্তর হইতে কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' লইয়া আসিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রথম ভাগের দ্বাদশ সংখ্যার ৩৭৬

পৃষ্ঠায় পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাইলাম। আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাঙ্গাল লিখিয়াছেন—"যে শক্তি প্রকাশ করে, সেই পুরুষ ; ব্রহ্ম শক্তি প্রকাশ করেন, অতএব ব্রহ্ম পুরুষ। আবার সর্ব্ব শক্তি যাহাতে আছে, সেই পুরুষ ; অতএব ব্রহ্ম ও পুরুষ একই কথা। যাহাতে বীজ থাকে, সেই কোষ। কোষ অপেক্ষা বীজ কোমল। পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষ দুইই আছে, এবং এই জন্যই সৃষ্টি। স্বভাবতঃ পুরুষ কঠিন, স্ত্রী কোমল। এই কাঠিন্য ও কোমলতার অনুভব জ্ঞান হইতেই, ব্রহ্মকে পুরুষ এবং তাঁহার শক্তিকে স্ত্রী বলা হইয়াছে। বাস্তবিক পুরুষের ইচ্ছা ও পুরুষ একই কথা। কিন্তু পৃথক অনুভব লীলারসের যেরূপ মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ প্রকাশেরও কিছু উপায় হইয়াছে, তাহা না হইলে কখনই সেরূপ হইত না। শক্তিপ্রকাশের নামই যে পুরুষত্ব, ইহার স্বভাবসিদ্ধ বিস্তর প্রমাণ আছে। পুরুষ কোন বিষয়ে শক্তি প্রকাশ করিলেই লোকে তাহাকে পুরুষত্ব বলে ; শক্তি প্রকাশ করিতে না পারিলে, আবার তাহাকে পুরুষত্বহীন বলিয়া থাকে। যে পুরুষত্বহীন, তাহার শক্তি নাই। যখন ব্রহ্মশক্তির উজ্জ্বল প্রভা চারিদিকেই দেখিতেছি, তখন ব্রহ্মকে পুরুষ না বলিব কেন ? যখন পুরুষত্ব প্রকাশক ত্রিগুণস্থ পুরুষকে আমরা সহজ-জ্ঞানহেতু পুরুষ বলিতেছি, তখন অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশক পুরুষকে আমরা পুরুষ বলিতে আর কোন্ জ্ঞানের অপেক্ষা করিব? আবার ধর্ম্মপথে কৃতার্থতা লাভকেও পুরুষত্ব বলে। এই পুরুষত্ব লাভ অনেক প্রকারে হইয়া থাকে। কেহ কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ, কেহ অদ্ভুত কার্য্য প্রকাশক নানা প্রকার শক্তিকে পুরুষত্ব বলিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, যে শক্তি লাভ অর্থাৎ শক্তিকে ধারণ করে, সেই পুরুষ। এই যে ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশিনী শক্তি ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইতেছে,

ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে ধারণ করিতেছে, করিবে ও করিতে পারে ?

"তাহার পর পুরুষের ধাতুতে জীবের সঞ্চার না হইলে স্ত্রীতে অবস্থান করে না ; ইহা সকলেই জানেন। কেন না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। অতএব, পুরুষ যখন গর্ভধারণ করিল, তখন সে অবশ্যই প্রকৃতি হইল ; যখন গর্ভ ত্যাগ করিল, তখন আবার যে পুরুষ সেই পুরুষই হইল। অতএব, গর্ভ-ধারণই যে স্ত্রীত্বের বিশেষ লক্ষণ, ইহার দ্বারা বিশেষ অনুভূত হইতেছে। কেবল মাত্র আকার প্রকার ভেদই স্ত্রীত্বের লক্ষণ নহে। এই প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন পুরুষ কখন স্ত্রী কখন পুরুষ, তদ্রূপ আবার স্ত্রীও কখন স্ত্রী কখন পুরুষ হইতেছে। অতএব, স্ত্রীই পুরুষ এবং পুরুষই যে স্ত্রী, তাহার স্পষ্ট কারণ স্ত্রীপুরুষেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার, যে ধারণ করে সেই পুরুষ। ধারণ নিমিত্তই যখন পুরুষ হইল, তখন যে স্ত্রী গর্ভধারণ করে, সে পুরুষ না হইবে কেন ? যদি এখানে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা কর "তাহা হইলে, পুরুষ যেমন একবার পুরুষ একবার স্ত্রী হয় ; সেইরূপ স্ত্রীও একবার, স্ত্রী একবার পুরুষ হয়; এ যে বাতুলের কথা।" বাস্তবিক এ বাতুলের কথা। যে ইহা দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে, সে বাতুল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভগবানের নিমিত্ত বাতুল না হইলে ইহা বুঝিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার এই ব্যাপার সামান্য চর্ম্মচক্ষুরও দৃশ্য নহে। কিন্তু যে ইহা বুঝিয়াছে, সেই বাতুল, না যে ইহা বুঝে নাই সেই বাতুল! সে যাহা হউক, এতদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে যে, যে একবার স্ত্রী একবার পুরুষ হয়, সেই পুরুষ ; আবার যে একবার পুরুষ একবার স্ত্রী হয়, সেই স্ত্রী। এই নিমিত্ত অনামিক অব্যয় ব্রহ্মের পুরুষ নামই সঙ্গত হইয়াছে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, ব্রহ্ম কি ? স্ত্রীপুরুষই যেমন পুরুষ, সেইরূপ পুরুষস্ত্রীই স্ত্রী। অতএব পুরুষ-প্রকৃতিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই পুরুষ-প্রকৃতি।

এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াই কাঙ্গাল ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কারণ ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভাবাবেশে গাহিয়াছেন—

দেখ ললিতে, আচম্বিতে, শ্যাম যে আমার শ্যামা হ'ল।
বাঁশী ফেলে বনমালী ঐ দেখ্ অসি করে নিল।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কথাও পড়িলাম, কাঙ্গালের কথাও পড়িলাম, তাঁহার গানও শুনিলাম। কিন্তু পাইলাম কি? বুঝিলাম কি? পাঠকগণ ইহার কি উত্তর দিবেন জানি না; কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে একটি কথা বুঝিলাম এই যে, কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়াছেন "ভগবানের জন্য বাতুল না হইলে ইহা বুঝিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় না।" তাই পাগল কাঙ্গাল হরিনাথ একদিন গাহিয়াছিলেন—

"কাঙ্গালের গেছে সজ্জা, লোকলজ্জা,
তোমার নামে পাগল দিনরজনী।"

এমনই করিয়া দিনরজনী 'নামে' পাগল হইলে তবে এ সকল কথা বুঝিতে পারা যায়। যতদিন তাহা হইতেছে না, ততদিন কি লইয়া অগ্রসর হইব? পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধু বলিতেছেন "শুধু বল, শুধু চাও—Light, light—more light; আলো আলো—আরও আলো!"

আর একদিন মনে হইল যে, লোকে এই যে 'কর্ম্ম'. 'কর্ম্মফল' বলে, এই 'কর্ম্ম' ব্যাপারটা কি? এ কর্ম্ম কোথা হইতে আসে? ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

"তুমি হৃষীকেশ হৃদয়ে থাকিয়া যাহাতে নিযুক্ত করিতেছ তাহাই করিতেছি।

তাহা হইলে আর কর্ম্মের বোঝা আমার স্কন্ধে চাপে কই! যিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, বোঝাও তিনিই বইবেন, আমি কোথাকার মাধাইদাস। যখন হৃষীকেশ তোমার হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, তখন তোমার কর্ম্মও নাই, অকর্ম্মও নাই, ধর্ম্মও নাই—অধর্ম্মও নাই, তুমি তখন ত মুক্তপুরুষ। কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনে হইল কাঙ্গালের রত্নভাণ্ডার একবার খুলিয়া দেখি না কেন; তিনি কর্ম্মের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। তখন কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ খুঁজিতে লাগিলাম;—কখনও ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিতে পারি না, কোন দিন পারিব বলিয়া আশাও করি না।

ব্রহ্মাণ্ডবেদে দেখিলাম, সবই পাওয়া যায়, সকল প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায়। তবে সে উত্তর যদি বুঝিতে না পারি, তাহার জন্য দোষী কে?—এই অধম। ব্রহ্মাণ্ডবেদ খুঁজিতে খুঁজিতে দ্বিতীয়ভাগের সপ্তম সংখ্যার ২০২ পৃষ্ঠায় দেখিলাম কাঙ্গাল 'কর্ম্মোৎপত্তি'র কথা লিখিয়াছেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রস্তাবটী পড়িয়া দেখিলাম। পাঠকগণকেও তাহা একবার শুনাই। প্রস্তাবটা একটু দীর্ঘ, কিন্তু 'কর্ম্ম ও 'কর্ম্মফল'ও ত ছোট নহে; তাহা শুনিয়াছি এক জীবনে শেষ হয় না, পরজীবনেও না কি তাহার জের চলে। অতএব এত জীবন দীর্ঘ কর্ম্মফলই যদি ভোগ করিতে পারেন, তখন তাহার সম্বন্ধে কাঙ্গাল যদি গুটিকয়েক কথা বেশীই কহিয়া থাকেন, তাহাও শ্রবণ করুন।

কাঙ্গাল বলিতেছেন—"ভগবান্ যখন নির্গুণ ব্রহ্ম ছিলেন, তখন কোন কর্ম্মই ছিল না। কর্ম্মের হেতু, সদসদাত্মিকা শক্তি, কালশক্তি, ও চৈতন্যশক্তি তাঁহাতে লীন ছিল। সুতরাং তখন কোন কর্ম্মই ছিল না। নির্গুণ ব্রহ্মের সেই শক্তিত্রয় প্রকাশের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট:জানা যাইতেছে যে, শক্তি-

প্রকাশের নাম গুণ। গুণের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম কর্ম্ম। অতএব এই অসীম জগৎ কেবল কর্ম্মেরই ব্যাপার। এই কর্ম্মের কর্ত্তা ভগবান্ এবং জীব। ইচ্ছাপ্রকাশ হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি অবধি ভগবান্ স্বয়ং কর্ত্তা ; তাহার পর হইতেই জীবের কর্ত্তৃত্ব। এই কর্ত্তৃত্বের নামই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার উপরে ভগবানের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা নহে। অগ্রে জীবের ইচ্ছাপ্রকাশ, পরে তৎসঙ্গে ভগবৎ-শক্তির যোগ হইয়া থাকে। ইচ্ছাপ্রকাশে জীবের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। এই নিমিত্ত জীব কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। অন্যথা জীব কর্ম্মফল-ভোগী হইত না। ভগবানের কি অদ্ভুত মায়াশক্তি ! এই মায়াশক্তিতে জীব অন্ধ হইয়া সদসৎ কার্য্য করিয়া আপনাকে সুখী ও দুঃখী মনে করিতেছে। এই মায়া ভেদ করিতে পারিলে জীব সুখদুঃখের অতীত হইয়া কেবল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে। অতএব, মায়াই ভগবানের লীলা এবং জীবের কর্ম্মোৎপত্তির হেতু। নতুবা তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ডলীলার প্রকাশ হইত না।

"ভগবানের প্রথম কর্ম্ম সদসদাত্মিকা শক্তির প্রকাশ। দ্বিতীয় কর্ম্ম, তাহাতে কালশক্তির যোগ। তৃতীয় কর্ম্ম, উভয় যুক্ত শক্তিতে চৈতন্যশক্তির প্রবেশ। চতুর্থ কর্ম্ম, ঐ চৈতন্যশক্তিতে পূর্ণ চৈতন্যশক্তির প্রভাদান। সূর্য্যরশ্মি যেমন চন্দ্রে পতিত হইয়া চন্দ্রকে আলোকিত করে, এই প্রভাদানও তদ্রূপ। জীবচৈতন্যে পূর্ণচৈতন্যের ব্রহ্মজ্যোতিঃ পতিত হইলে চন্দ্রের ন্যায় জীবও ক্রমান্বয়ে আলোকিত হইয়া পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ হয় ; এবং চন্দ্র যেমন অন্ধকারচ্যুত হয়, জীবও তদ্রূপ মায়াজন্য কর্ম্মচ্যুত হইয়া বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। চন্দ্র যে ক্রমে জ্যোতিষ্মান্ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিশূন্য হয়, তাহার কারণ যেমন একমাত্র সূর্য্যেরই জ্যোতিঃ ; তদ্রূপ জীব যে পুণ্যপথে

প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হয় এবং পাপপথে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে, ভগবান্‌ই তাহার কর্ত্তা। চন্দ্র যে শক্তিতে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে সূর্য্যের সম্মুখীন হইয়া আলোকিত হয় ও সমস্থত্রতা লাভ করিয়া পূর্ণচন্দ্র হয়, এবং পুনরায় সমস্থত্রতা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও আলোকশূন্য হয়, জীবেরও সেই শক্তি আছে। উক্ত শক্তির নামই জীবের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই জীবের কর্ম্মোৎপত্তি ও কর্ম্মক্ষয়ের কারণ এবং জীব কর্ম্মজন্য সুখদুঃখের ভাগী।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কাঙ্গালের হৃদয়ে কি এক ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেই ভাবের প্রেরণায় তিনি গাইয়া উঠিলেন—

"মা যার আনন্দময়ী, তার ছেলে যে নিরানন্দ।
ধনীর ছেলে কাঙ্গাল হয় রে, নিতান্ত তার কপাল মন্দ।

১। গঙ্গাতীরে বসত ক'রে, যে জন পিপাসায় মরে,
বিধির বিধান ফেরে, স্রোতস্বতীর স্রোতঃ বন্ধ।

২। অন্নপূর্ণা-রন্ধনঘরে, সন্তানগুলি ক্ষুধায় মরে
মনের ব্যথা ব'লব কারে, পদ্মলোচন জন্ম-অন্ধ।

৩। বেদবেদান্ত ভেবে অন্ধ, পণ্ডিত হলেন ধন্ধ,
দেখ্‌রে, কাঙ্গাল মতি মন্দ, (পদ্ম) ফুলের চাকায় নাই রে গন্ধ।"

এই স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি যে, কাঙ্গাল যখন 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' প্রণয়ন করেন, তখন তিনি স্বহস্তে লিখিতেন না। তিনি তত্ত্ব কথায় এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, লেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সেই সময়ে যে কেহ নিকটে যাইতেন, তিনিই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। ভাবের আবেগে তিনি গাইয়া বা বলিয়া যাইতেন; তখনই তাহা লিখিয়া লইতে হইত। কাগজ কলম প্রভৃতি লইয়া আয়োজন

করিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদের গান বা কোন প্রস্তাব বা তত্ত্ব লিখিতে পারিতেন না। এ সময়ে তাঁহার সে অবস্থা অতীত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার অনেক গান, অনেক কথা রক্ষিত হইতে পারে নাই। আমরাই অনেক সময়ে আলস্যবশতঃ লিখিয়া লই নাই। এখন সেই কথা মনে করিয়া হায়, হায় করিতেছি!

উপরিউক্ত গানের পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কাঙ্গাল আবার পূর্ব্বের সেই কথা ঠিক মত ধরিয়া বলিয়াছেন—"আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তৎসমুদায় চিন্তা করিয়া দেখ, প্রকৃতির প্রকাশ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম স্বয়ং কর্ত্তা, প্রকৃতিপ্রকাশের পর হইতে যাহা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিয়া কেবল দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তা হইয়াছেন। জীব যখন যে কর্ম্ম করে, আপনার জীবচৈতন্যের শক্তিতেই করিয়া থাকে। তাহাতে পূর্ণচৈতন্যশক্তি ব্রহ্মের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া কেবল দর্শন করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক যে পরোপকার করেন, অধার্ম্মিক যে পরের অপকার করিয়া থাকে, জীবচৈতন্যশক্তি তাহার কর্ত্তা। পরোপকারের নিমিত্ত জীব যখন আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং পরাপকারের নিমিত্ত যখন আত্মগ্লানি ভোগ করে, তখন ভগবান্ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় এ স্থলে জীবের স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে আত্মগ্লানি কখনও উপস্থিত হইত না এবং জগতে কেহই দণ্ডভোগ করিত না। সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করুক, সকল জীবই ইচ্ছানুসারে আত্মপ্রসাদামৃত পান এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিত। যদি জীবের সদসৎ কর্ম্মে ভগবানের সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব থাকিত, তবে জীব যাহা করিতেছে, তিনি তাহা করাইতেছেন; তন্নিমিত্ত জীব কর্ম্মভোগের ভাগী হইত না। বস্তুতঃ অনেকে ভগবানের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব ও অব্যক্ত-কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে না পারিয়া "ঈশ্বর যাহা করান, তাহাই

করি; তন্নিমিত্ত আমি পাপের ভাগী হইব কেন?" দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠানের সময় এই প্রবোধবাক্যে লজ্জাভয়ে ভীত মনকে পাপকার্য্য করিতে সাহস প্রদান করিয়া থাকে।

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—"হে ভগবান, তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যাহা আমাকে করাও তাহাই আমি করি" এই ঋষিবাক্যের অবস্থা ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মূর্খ লোকে ঐ ভাবে রত্নহার ভ্রমে বিষধর ভুজঙ্গ ধরিয়া থাকে। কেন না উক্ত বাক্যটী সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষে নহে। সাধন করিয়া সাধক যখন চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত হন, বালক বালিকার মত একবারে ইন্দ্রিয়-বিকারশূন্য হইয়া আত্মপর, মানাপমান, অঙ্গার সুবর্ণ, গরল অমৃত, সকলই একরূপ মনে করেন, উক্ত বাক্যটি এই চতুর্থাবস্থাপন্ন সাধকের বাক্য। বাস্তবিক তিনি যাহা করেন তাহা ভগবান্ করান; তিনি যাহা বলেন তাহা ভগবান্ বলান। যেমন সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া চন্দ্র পৃথিবীকে আলোক দান করে, তিনিও তদ্রূপ ব্রহ্ম প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত হইয়া বাক্য বলেন এবং কার্য্য করেন। ভগবানের যে অব্যক্ত শক্তি অব্যক্তভাবে জগতের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া আছে, তখন তাঁহার নিকটে তাহা আর অব্যক্ত থাকে না। সাধক তখন জ্যোতির্ম্ময় হন। ইহারই নাম মুক্তি। ভগবান্ কি, আদৌ যাহাদিগের সে জ্ঞান নাই, যাহাদিগের আত্মা সূর্য্যালোকশূন্য চন্দ্রের ন্যায় অন্ধকারময়, পাপাচরণই যাহাদিগের কর্ম্ম, এমন ব্যক্তি যদি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই বাক্যানুসারে কার্য্য করে, তবে সে ব্যক্তি কোন পাপকর্ম্মই অকর্ত্তব্য মনে করে না। কর্ম্মসিন্ধুমন্থনে যেমন নানাপ্রকার অমৃত উত্থিত হয়, তদ্রূপ গরলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।" এইস্থানে কাঙ্গাল আবার গান ধরিয়াছেন।

গানটী এই—

ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছায়' ভ্রমে জীব সমুদায়,
আবাসে, প্রবাসে, আর বনবাসে যথায় তথায়।
কেহ বৈষ্ণব অনুরাগী, তোমায় ভোলে বিষয় লাগি,
কেহ যোগী সর্ব্বত্যাগী, বৈরাগী বৃক্ষের তলায়।
মাগো, শ্মশানসন্ন্যাসী ভবনকাননবাসী,
ভালবাসি মুক্তকেশি, যা কর মা আমায়;
বিষয় বিষের হ্রদে, না ডুবি ভ্রমপ্রমাদে,
বিপদে সম্পদে তব পদে মতি মাতিয়া রয়।
ও মা, কেহ বলে কর কর্ম্ম, কেহ বলে জ্ঞানই ধর্ম্ম,
নানা মুনির নানা ধর্ম্ম, ভক্তি বিনা মুক্তি কোথায়;
শোন্ রে কাঙ্গাল বলি আমি, যা করাই তাই কর তুমি,
ভ্রমণ কর কর্ম্মভূমি, জল যেমন পদ্মপাতায়।"

কাঙ্গাল ত গান গাইয়াই কথা শেষ করিয়া দিলেন। আমি কাঙ্গালের কথার সারসংগ্রহ করিয়া দেখিলাম বন্ধুর কথাই ঠিক। তিনি আমাকে বলিলেন, "মনে রাখিও, light, light,—more light—আলো, আলো—আরও আলো!"

[৯]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—কর্ম্ম।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, এবারও কর্ম্মের কথা বলিব। মানুষের মধ্যে যত গোল, সকলই কর্ম্ম লইয়া। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য হইলে গোল মিটিয়া যায়, ইহাই সাধুজনের উক্তি। আমি সেই সাধুজনের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিতেছি মাত্র। এবারও কর্ম্মসম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ আরও যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোতাপাখীর মত আবৃত্তি করিব ; কারণ আমার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া কিছুই ঠিক হয় নাই।

'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন, অজীব ও সজীব প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ই কর্ম্ম। কর্ম্ম না থাকিলে এ ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই থাকে না, কেবল নির্গুণ ব্রহ্মই থাকেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম শ্লোকে এ কথা স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে ; যথা—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

"কেহ কথনও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না। (ইচ্ছা না করিলেও) প্রাকৃতিক গুণ সমুদায়ই সকলকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে।"

এই কর্ম্মের দুইটী শক্তি আছে ; একটী উর্দ্ধগা শক্তি, অপরটী নিম্নগা শক্তি। উর্দ্ধগামিনী শক্তিতে লোকে ক্রমে উর্দ্ধে নীত ও কর্ম্মহীন হইয়া ভগবানকে লাভ করে, এবং নিম্নগামিনী শক্তিতে অধোগতি লাভ করিয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কর্ম্মফল পরিত্যাগই কর্ম্মের উর্দ্ধগতি এবং কর্ম্মত্যাগ ; সুতরাং কর্ম্মত্যাগই ব্রহ্মলোকের একমাত্র উপায়। কর্ম্মত্যাগী নরশ্রেষ্ঠ-ই ভগবান লাভের প্রকৃত পাত্র।

ভগবানের প্রিয়কার্য্যকে শুভকর্ম্ম বলে। শুভকর্ম্মের যে ফল-কামনা, তাহারই নাম পুণ্য। কর্ম্মের যে ব্যভিচার, তাহাই কর্ম্মের নিম্নগতি এবং তাহাই পাপ শব্দে উক্ত হইয়াছে। এই পাপযুক্ত কর্ম্মই ত্যাজ্য। ব্রহ্মকে লাভ করিতে যাঁহার ইচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞানিগণ তাঁহার পক্ষে পুণ্যও ত্যাজ্য বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিংতস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥"

"সমুদায় জগতের মূল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি আছে, তাহার ধর্ম্মার্থ কামে কি প্রয়োজন, কারণ মুক্তি তাহার করস্থ।"

এই পুণ্যত্যাগের প্রকৃত অর্থ পুণ্যকর্ম্মের ফল পরিত্যাগ। পাপকর্ম্মের ফল যেমন নরকভোগ ; পুণ্যকর্ম্মের ফল তদ্রূপ স্বর্গাদি সুখভোগ। বাসনা অর্থাৎ কর্ম্মের ফলভোগেচ্ছাই কর্ম্মের মূল। বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কর্ম্মের মূল নষ্ট হয় না। যেমন বৃক্ষের শাখাদি ছেদন করিয়া মূল রাখিলে পুনরায় অনেক বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ বাসনা থাকিলে পুনরায় কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বাসনা দুই প্রকার,—শুভবাসনা ও অশুভবাসনা। শুভবাসনা হইতে পুণ্যের উৎপত্তি এবং অশুভবাসনা হইতে পাপের জন্ম হইয়া থাকে। শুভবাসনা হইতে পুণ্যকর্ম্মের উৎপত্তি

হয় এবং সেই পুণ্যই ভগবানের নিত্যানন্দধামে গমন করিবার পথ বটে। কিন্তু পথ কখনও নিত্যানন্দধাম নহে। তুমি কোন তীর্থস্থানে যাইতে পথবহন করিতেছ ; সেই পথ যেমন তীর্থ স্থান নহে এবং বহন করিয়া পথ পরিত্যাগ না করিলেও তীর্থগমন উপস্থিত হইতে পারে না ; তদ্রূপ পুণ্য পরিত্যাগ না করিলেও সেই নিত্যানন্দধামে কেহ যাইতে পারে না। অশুভবাসনা হইতেই পাপকর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং সেই পাপই লোকের অধোগতির কারণ। যেমন আলোক ও অন্ধকার, সেইরূপ পুণ্য আর পাপ। অন্ধকারময় স্থানে যেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ পাপাচ্ছন্ন চিত্ত হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারে না। পাপ পরিত্যাগ করিব বলিলেই যে, লোকে হঠাৎ পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা নহে। আলোক না জ্বালিলে যেমন অন্ধকার যায় না, সেইরূপ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত পাপ দূর হয় না। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পাপাসক্ত ব্যক্তি-গণের প্রতি নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার যাঁহারা পুণ্যপথে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দধামে যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি সে সত্য উপদেশানুসারে পুণ্য পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিত্যানন্দ-ধামে যাইতে পারে না ; সে যতই পুণ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, ততই ঘোরতর অন্ধকার স্থানে পতিত হইয়া ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব চিকিৎসক যেমন রোগবিশেষের পৃথক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন, পণ্ডিতগণও তদ্রূপ অধিকারবিশেষে ধর্ম্মপথের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এক রোগে অন্য ঔষধ যেমন অপকারী হয়, তদ্রূপ এক প্রকার অধিকারীর পক্ষে অন্য প্রকার ধর্ম্মনিয়ম বা ব্যবস্থা অপকারক হইয়া থাকে। চিকিৎসক ব্যতীত যেমন রোগের নির্ণয় হয় না, সেইরূপ গুরু ব্যতীত ধর্ম্মপথগামী লোকের অধিকার নিশ্চয় করিতে অন্য কাহারও

সাধ্য নাই। চিকিৎসক ব্যতীত আপনাআপনি আপনার রোগনির্ণয় এবং তাহার ব্যবস্থা করিলে লোকের যে দশা হইয়া থাকে, গুরু ব্যতীত আপনা আপনি ধর্ম্মপথে গমন করিলেও অনেক স্থলেই তাহাই উপস্থিত হয়।

এ গুরু সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ কি বলিয়াছেন, তাহা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এবার কাঙ্গালের একটি গান তুলিয়া দিয়াই কর্ম্ম-কথা শেষ করিতেছি। গানটী এই—

না গেলে ভাই মনের মলা।
শুধু চোক বুঁজলে হয় চোখের জ্বালা॥
তন্ত্র মন্ত্র বেদ অধ্যয়ন, মনের মলা নাশের কারণ;
তা' যদি না হ'ল কখন, মিছে তীর্থবাসে গেল বেলা॥
(ভূতের বেগার খেটে যায় যে বেলা)
জলের মলা নাহি গেলে, না পড়ে কায়ার ছায়া জলে;
মন্ ডুবিয়ে থাক্‌লে মলে, ও তার বিফল হয় হরি বলা॥
(জপের মালা)
কাঙ্গাল বলে রে ভাই, যদি চাও জগতের গোঁসাই;
কাম ক্রোধ কর রে ছাই, তখন দূরে যাবে চোখের ঘোলা॥

[১০]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—গুরুবাদ ।

কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' গুরুবাদ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, সেই কথা এইবার বলিব। আমার নিজের কথা আমি এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করিব না; আর আমার মতামত, আমার ধারণা, আমার বিশ্বাসের কথা শুনিবার জন্য কাহারও আগ্রহ হইতে পারে না। গুরুবাদ সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ কি বলিয়াছেন, তাহারই আভাস আমি দিব। এ বিষয়ে কাঙ্গালের সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ তাহাতে গভীর কথা কিছুই থাকিতে পারেনা। ক, খ শিখাইবার সময় শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের যে ভাবে শিক্ষাদান করেন, তাহার মধ্যে উচ্চ কথার, গভীর সাধনতত্ত্বের স্থান নাই।

'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' নানা স্থানে কাঙ্গাল হরিনাথ গুরুবাদ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন; সে সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে গেলে প্রস্তাব অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে; এই জন্য আমি দুই একটি স্থান হইতে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিব; তাহা হইতেই সুধী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণ তাঁহার মত অবগত হইতে পারিবেন। কাঙ্গাল যে প্রকার সহজ ভাষায় কথা বলিতেন, তাহাতে তাঁহার কথার টীকা টিপ্পনি করিবার প্রয়োজন কোন দিনই অনুভূত হয় নাই; বিশেষতঃ আমার মত অনধিকারীর পক্ষে সে চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা ও প্রগল্‌ভতা।

কাঙ্গাল 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে'র এক স্থানে বলিয়াছেন—"আচার্য্য বেদাধ্যাপক

ও শিক্ষাগুরু। যিনি বেদের উপদেশ প্রদান করেন, কিংবা যিনি সৎশিক্ষা অর্থাৎ যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, এইরূপ শিক্ষা দান করেন, তিনিই আচার্য্য। যাহাতে আত্মোন্নতি হয়, এ কথা বেদবেত্তা ব্যতীত কেহ জানে না। বেদ অধ্যয়ন করিলেই যে, বেদ কি তাহা জানা যায় অর্থাৎ বেদান্ত হওয়া যায়, তাহা নহে। বেদাধ্যয়ন আর বেদবেত্তা স্বতন্ত্র কথা। যিনি বেদের তত্ত্ব জানেন, তিনি বেদবেত্তা। চতুর্ব্বেদের একই তত্ত্ব নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম এবং তাঁহার স্বরূপ। স্বরূপকেই সবিশেষ ব্রহ্ম বলে। যিনি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তিনিই বেদবেত্তা। জানেন, এই ক্রিয়ার তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয় নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব এবং সবিশেষ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন। অনুভব জ্ঞানের কার্য্য, প্রত্যক্ষ ভক্তির কার্য্য। অতএব বেদ অধ্যয়নে যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে, তিনিই আচার্য্য। অনেকে বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ব্যুৎপন্নও হইয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। যোগসাধন করিতে করিতে যাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশ হয় নাই, তিনি বেদাধ্যাপক বলিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, বেদাধ্যয়ন করুন, বা না করুন, জ্ঞান ও ভক্তির প্রসাদে বেদের তত্ত্ব জানেন। অতএব যাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশ হয় নাই, তিনি বেদাধ্যয়ন করিতে জানেন, বেদ কি তাহা জানেন না। যিনি বেদ জানেন, তিনিই আচার্য্য। এই আচার্য্যের সেবা দুই প্রকার ; সেবা ও শুশ্রূষা। আচার্য্যের আদেশ শ্রবণ ও পালন, ইহাকেই শুশ্রূষা বলে, এবং আচার্য্যের পূজাদির নাম সেবা। আচার্য্য তোমার মত অবয়বযুক্ত মানব হউন ; যখন তাঁহাতে ব্রহ্মশক্তি কুণ্ডলিনীর প্রকাশ হইয়াছে, তখন তিনিও শক্তিমান্, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কারণ ব্রহ্মেতেও যে শক্তি বিরাজ করিতেছে, তাঁহাতেও সেই শক্তির প্রকাশ হইয়াছে। অতএব, আচার্য্য অর্থাৎ গুরুদেবকে গুরুব্রহ্ম বলিলে আর কি দোষ হইতে পারে ?

তবে, ব্রহ্ম পূর্ণ শক্তিমান্, আর আচার্য্য যেমন সেইরূপই, অপূর্ণ শক্তিমান্, এইমাত্র বিশেষ। যিনি ব্রহ্মবাক্য বেদের ন্যায় আচার্য্যের কথা না শুনেন, অর্থাৎ আচার্য্য যেরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দেন, তদ্রূপ কার্য্য না করেন, তাঁহার আচার্য্য-শুশ্রূষা হয় না। যে ব্যক্তি আচার্য্যের বাক্য অনুসারে চলে না, অথচ পূজনাদি তাঁহার সেবা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি আচার্য্যসেবা বিষয়ে ব্যভিচার করে। এই ব্যভিচারের ফলে, উক্ত ব্যক্তি কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। লোকে যে গুরুর নিকট উপদেশ ও মন্ত্র গ্রহণ করিয়াও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক হইয়া উঠে, গুরুসেবা-শুশ্রূষার ব্যভিচারই তাহার কারণ। এখন কিন্তু গুরু ও শিষ্য আছেন, অথচ স্বেচ্ছাচার পাপাচার ব্যভিচার ও নাস্তিকতার অবধি নাই। ইহার প্রধান কারণ, আচার্য্যের অন্তর্নাস্তিকতা; দ্বিতীয় কারণ শিষ্য আচার্য্য-সেবা করিতে জানেন না এবং আচার্য্যও প্রকৃত শিষ্যপালন জানেন না। পিতামাতার সন্তান-পালন অপেক্ষাও আচার্য্য-সেবা গুরুতর। অধিকাংশ গুরুশিষ্য তাহা নহেন। পিতামাতার পালনে জীবের শরীর বর্দ্ধিত হয় এবং আচার্য্যের পালনে আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। এখনকার গুরুগণের মধ্যে আত্মা কি, শরীর কি, ইহাও অনেকে জানেন না। আবার শিষ্যগণ আচার্য্যকে আপনার ন্যায় সামান্য মানুষ বিবেচনা করিয়া থাকেন। অতএব শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের কর্ত্তব্যের ব্যভিচার এবং আচার্য্যের প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য-ব্যভিচার, এই উভয় ব্যভিচার যুক্ত হইয়া যে পরম ব্যভিচারের উৎপাদন করিয়াছে, তাহাতেই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারিতা নাস্তিকতার প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ গুরু-শিষ্য ব্যতীত যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে যত্ন বা চেষ্টা করুন, কিছুতেই কৃতকার্য্য

হইতে পারিবেন না। কারণ, ভগবান্ স্বয়ং গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার স্বরূপ, রূপ, রস ও শক্তি লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন, এবং সাধন করিতে পারিলে এখনও মনুষ্যের ললাটে গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া আপনার স্বরূপাদি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কেহ তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এখন কিন্তু সকলেই গুরু হইতে চাহেন, কেহ শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন না। যে বলে সেই গুরু, যে শুনে সেই শিষ্য। গুরুও যে শক্তিতে বলেন, শিষ্যও সেই শক্তিতে শুনিয়া থাকেন। এই শক্তি কি? ইহার নাম কুণ্ডলিনী শক্তি। কুণ্ডলিনী যাঁহার প্রকাশ হইয়াছে, তিনি গুরু এবং কুণ্ডলিনী যাহা দ্বারা প্রকাশিতা হন অর্থাৎ তিনি অব্যক্তা হইয়াও সব্যক্তা হন, তাহারই নাম গুরুমন্ত্র। আবার সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যিনি অব্যক্তরূপিণী কুণ্ডলিনীকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তিনি শিষ্য। এই গুরু-শিষ্যের মধ্যে কেহই ন্যুন নহেন, উভয়েই সাধু। বস্তুতঃ এই গুরুশিষ্য প্রথা ব্যতীত ভগবৎতত্ত্ব জানিবার অন্য উপায় নাই, ইহা অব্যর্থ সত্য। প্রকারান্তরে বা রূপান্তরে ঐ প্রকার কার্য্য সাধিত হইলে তাহাকেও গুরুশিষ্য প্রথা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ইহা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার আর উপায় নাই।"

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে কাঙ্গাল হরিনাথ অনেক স্থলে "কুণ্ডলিনী শক্তির" কথা বলিয়াছেন; কেবল বলা নহে, ঐ শক্তিমান্‌কেই তিনি প্রকৃত গুরু বলিয়াছেন। যাঁহারা যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা যোগসাধন করিয়াছেন, তাঁহারা "কুণ্ডলিনী" কি, তাহার স্বরূপ কি, তাহা বিশেষভাবে অবগত আছেন; কিন্তু যাঁহারা যোগশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, বা যাঁহারা উক্ত পথের পথিক নহেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 'কুণ্ডলিনী' কি? তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন

বোধ করিতেছি ; কারণ, 'কুণ্ডলিনী' কি, তাহা না বুঝিলে উদ্ধৃত অংশের অর্থ ও মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না। এ স্থলে একটী কথা সর্ব্বাগ্রে বলিয়া রাখিতেছি। আমি 'যোগ' 'বিয়োগ' কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। যোগ সম্বন্ধে কাঙ্গালের একটা গান শুনিয়াছিলাম, তাহাই আমার মনে আছে এবং সেই গান শুনিবার পর দুই একখানি পুঁথি নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম। আমি কুণ্ডলিনীর সম্বন্ধে সেই পুঁথিপড়া কথাই বলিব ; হাতে কলমে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন এবং আমার যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা আমাকে অজ্ঞান জানিয়া ক্ষমা করিবেন। মূল কথাটা বলিবার পূর্ব্বে যে গানটির কথা বলিলাম, তাহাই শুনাইয়া দিই। গানটি শুনাইবার একটা কারণ আছে। আমি কাঙ্গালের গানের মধ্যে তাঁহাকে যেমন দেখিতে পাই, তাঁহার কথা যেমন বুঝিতে পারি, আর কিছুতেই তেমন পারি না, তাই যখন-তখনই যেখানে-সেখানেই আমি কাঙ্গালের গানই তুলিয়া দিই। সত্য সত্যই গানের মধ্যেই কাঙ্গালকে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমি যে গানের কথা বলিয়াছি, তাহা এই—

"সৃষ্টি-যোগে, স্থিতি-যোগে, যোগ বিয়োগে সংহার হয়।
শোন্‌রে কাঙ্গাল ফিকির তোরে যোগবিয়োগের এই পরিচয়। (বলি)

১। সৃষ্টি স্থিতি সংহার কথা, একই তত্ত্ব, পৃথক কোথা,
প্রকাশ-অপ্রকাশ যথা লীলাখেলা সমুদায়।

২। নিত্যলীলা নিত্য বর্ত্তমান, যোগ বিয়োগ উভয় সমান,
মর্ত্তলোকে তার প্রমাণ বাল্যখেলা নিষ্কামময় ;
ভুতময় দেহ ঘটে, বিয়োগ রয়েছে বটে,
মায়াজাল যদি কাটে, সে বিয়োগ বিয়োগ নয়।

৩। দেহে আত্মাপুরুষ আছে, যেজন তাতে যোগ করেছে,
যোগ বিয়োগ তার সব ঘুচেছে, এক হয়েছে সৃজন লয় ;
কাঙ্গাল বলে সেই যোগ দে মা, যে যোগে আর বিয়োগ হয় না,
কামের দাসত্ব থাকে না, মর্ত্তলোক হয় আনন্দময়।

এইবার আমার পুঁথিপড়া কথা বলি। যোগশাস্ত্রে বলে, মানুষের দেহে সার্দ্ধ তিনলক্ষ রসসঞ্চারিণী প্রণালী আছে ; তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশটি প্রধান। ইহারাই নাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; আর গুলির নাম শিরা, প্রশিরা প্রভৃতি। ঐ চতুর্দ্দশটি নাড়ীর মধ্যে আবার তিনটি শ্রেষ্ঠ ; তাহাদের নাম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইড়া সংসার-গতি-প্রদায়িনী ; ইনি দেহের বাম দিকে রহিয়াছেন। পিঙ্গলা স্বর্গবর্ত্ম্য-প্রদর্শিনী ; ইনি দেহের দক্ষিণ দিকে রহিয়াছেন। আর এই দুইয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছেন সুষুম্না ; ইনি ত্রিগুণময়ী, প্রকৃতিস্বরূপা, সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী ও পরমার্থ-পথ-প্রদর্শিনী। এই সুষুম্না নাড়ির সাতটী গ্রন্থি, সপ্ত-পদ্ম বা চক্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাতটী গ্রন্থি বা পদ্ম বা চক্রের নাম—(১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান (৩) মণিপুর (৪) অনাহত (৫) বিশুদ্ধ, (৬) আজ্ঞা, এবং (৭) সহস্রার। ইহার মধ্যে প্রথম চক্র মূলাধারে অর্থাৎ পৃথি্শক্তিময়চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্রে বলে ইনি ব্রহ্মলীলা-প্রকাশিনী, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমদায়িনী, সুতরাং ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। এই স্থানেই আমার বক্তব্য শেষ হইল। ইহার পর যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন 'এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে কেমন করিয়া জাগ্রত করিতে হয় ? কুণ্ডলিনী শক্তির বিকাশ হইলে কি হয় ?' তাঁহাকে আমি সরল ভাবে বলিতেছি, তাহা আমি জানি না ; আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। স্কুলে ভূগোলসূত্রে যেমন কামস্কটকার বিবরণ পড়িয়াছি, তাহার সম্বন্ধে যেমন আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, কুণ্ডলিনী সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান

তদ্রূপ। যিনি সে সকল কথা জানিতে চান, বুঝিতে চান, হাতে কলমে করিতে চান, তিনি একাগ্রচিত্তে জগদ্‌গুরুকে ডাকুন ; তিনি গুরু মিলাইয়া দিবেন ; সেই গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে তখন আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন থাকিবে না।

এই স্থানে ফিকিরচাঁদ ফকিরের একটা গান তুলিয়া দিয়া আমি আপাততঃ এ কথা শেষ করিতেছি। গানটি এই—

যদি বৈরাগী হবে, শুন তবে, তার উপায় রে মন!
গুরুপদারবিন্দে, যশঃ নিন্দে কামাদি কর অর্পণ।
(তোমার সর্ব্বস্ব ধন)

১। তোমার, দেহভাণ্ডে যথাসর্ব্বস্ব, কামক্রোধ লোভ মোহ সুখ ঐশ্বর্য্য ;
এ সব, বিষয় গেল, আশায় রইল শ্রীগুরুর চরণ-সাধন।
(বৈরাগীর লক্ষণ)

২। কামক্রোধ যার রাজা হয়েছে, বন্দী ক'রে কারাগারে ফাটক খাটাচ্ছে ;
ও তার, রাগানুগা, কাম-সোহাগা, গড়াচ্ছে কালের গড়ন।
(সং সাজাইতে)

৩। জ্ঞানপ্রেম শ্রীগুরুর চরণ, সর্ব্বরাগে সর্ব্বক্ষণ যে করে রমণ ;
সেই ত রাগ বিরাগে, অনুরাগে বৈরাগ্য করে গ্রহণ।
(সংসার-বিবেকী হয়ে)

৪। ফিকির কয়, এই সোজা কথা ভাই, কিছু মাত্র নিজের স্বার্থ
যার মনেতে নাই ;
সে জন, উদাসীন আর গৃহী হোক, পূজা করি তাঁর চরণ।
(তিনি যে জাতি হন)

[১১]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—জাতিভেদ।

আমাদের দেশে হিন্দুর জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বদেশী বিদেশী অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। জাতিভেদের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বাদানুবাদ, অনেক বাক্যব্যয় হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, তাহার পুনরালোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। বিশেষতঃ আমি কাঙ্গাল হরিনাথের কথাই বলিতে বসিয়াছি; এখানে অন্যের মতামত আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। আরও এক কথা; যে ক্ষেত্রে মহা মহা পণ্ডিতগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং এখনও যাঁহারা সমরক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন, সেখানে আমার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির কোন মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলিয়াই আমি মনে করি। তবে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন; কাঙ্গাল হরিনাথও তাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' এ সম্বন্ধে স্পষ্টবাক্যে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করা জীবনী-লেখকের পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করিয়াই আমি এ কথার অবতারণা করিতেছি। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনপথে যে স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, সেখানে কোন ভেদই ছিল না। আমি ইতঃপূর্ব্বে কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনী সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাতে কাঙ্গাল কি ছিলেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি কোন ভেদ মানিতেন কি না,

তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়াছি। এই প্রস্তাবে আমি 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' হইতে দেখাইব যে, কাঙ্গাল হরিনাথ জাতিভেদ সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন।

কিন্তু প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কাঙ্গাল হরিনাথের রচিত একটী গান আমি তুলিয়া দিতে চাই। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, আমি কাঙ্গালের গানের মধ্যেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে ধরিতে পাই। যে তত্ত্বের মীমাংসার জন্যই কাঙ্গালের মুখের দিকে চাই, সেই কথাই তাঁহার গানের মধ্যে পাই, সেই কথার মীমাংসাই তিনি তাঁহার গানের ভিতর দিয়া করিয়াছেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাত্মার অতুল জ্ঞান, অপার ভক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই। এখন সুধু মনে হয়, এমন অমূল্য রত্নের খনি হাতের কাছে পাইয়াও অন্ধ আমি, কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই। যখন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, যখন তাঁহার পবিত্র সাহচর্য্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তখন কত বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু একদিনও কোন কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, একদিনও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া গভীর তত্ত্ব-কথার উপদেশ গ্রহণ করি নাই। তাঁহাকে ব্যাকরণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ভাষার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, লেখার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইয়াছি; কিন্তু যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে নিহিত ছিল, যে সকল ভাবের আভাস তিনি তাঁহার গানে দিয়া যাইতেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম জানিবার জন্য কোন দিন তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই। আমাদের অদেয় ত তাঁহার কিছুই ছিল না; তাঁহার সদাব্রতের দ্বার ত সকলের জন্যই মুক্ত ছিল; কিন্তু আমরা তখন সে দ্বারের সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াই নাই, সে দেবালয় হইতে প্রসাদ গ্রহণ করি নাই। তাই এখন তাঁহার কথা বলিতে বসিয়া তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদ,

তাঁহার গীতাবলির মধ্য হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি!

যাক্, সে কথা বলিয়া আর কি হইবে? যাহা গিয়াছে, হেলায় যাহা হারাইয়াছি, তাহার জন্য অনুশোচনা করিয়া কি করিব? এখন তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই মধ্য হইতে তাঁহার স্বরূপ বাহির করিতে হইবে। তাই এই জাতিভেদের কথা বলিতে আরম্ভ করিতেই তাঁহার একটি গান সর্ব্বাগ্রে আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই গানটিই আমি প্রথমে পাঠকগণকে উপহার দিই। আমার ত মনে হয়, এই গান হইতেই জাতিভেদ সম্বন্ধে কাঙ্গালের মনের কথা সকলে বুঝিতে পারিবেন। গানটি এই—

"যারা সব জাতের ছেলে
জা'ত নিয়ে যাক্ যমের হাতে।
বুঝেছি জাতের ধর্ম্ম,
কর্ম্মভোগ কেবল জেতে।

১। অজাতে জন্ম হোলো, জাতের বিচার কি করব বল,
মা-বাপের নাই জাতিকুল, কুলধ্বজ কুলাচার মতে। (আমি)

২। সগোত্রে বিবাহ আমার, সকল কুলের কুলীন আবার;
কুলাচার শাস্ত্র আমার, নিষেধ জাতিকুল রাখিতে! (কুলাচারে)

৩। মা আমার কুণ্ডলিনী, অকুলের কুলকারিণী,
মূলাধারে জাগ্‌লে তিনি, কুল ডোবে রে অকূলেতে। (জাতি)

৪। কাঙ্গালের জাত কুল কোথায়, জাত হারায় অজাতের সেবায়;
একঘ'রে করেছে সবায়, নিষেধ নিমন্ত্রণ দিতে। (যমের)"

জাতিভেদ সম্বন্ধে কাঙ্গালের আর একটি গানও এই স্থলে উদ্ধৃত

না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গানটি উপরি-উদ্ধৃত গানটির অপেক্ষা অধিক সরল। গানটি এই—

"সবে হচ্চে পার, যাচ্চে এক খেয়ায়।
এ কি চমৎকার, কেহ কার ছোঁয়া পানি নাহি খায়।
১। এক খেয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, সকল জেতের পারে লয়ে যায় ;
এক আকার সবাকার, তবু জাতবিচার দেখায়।
২। এক নদীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আদি করছে জলপান ;
সেই জল তুলে, কেউ ছুঁলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়।
৩। এক বাতাসে সবাই করছে বাস, সেই বাতাস আবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ;
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই,
অবিশ্বাস কথায় কথায়।
৪। এক সূর্য্যের আলোক পায় সবাই, আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায় ;
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব, প্রেমভাব নাই দুনিয়ায়।
৫। কাঙ্গাল বলিছে, সকলেই সমান, সবে মুখে বলেন কাজে না দেখান ;
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদজ্ঞান কভু না যায়।

এই দুইটি গানেই কাঙ্গালের মনের কথা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' কাঙ্গাল হরিনাথ জাতিভেদ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম আমরা পাঠকগণের গোচর করিব। কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়াছেন—

লোকে যে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ নানা প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কার্য্যবিশেষকে উচ্চ ও নীচ মনে করিয়া লোকে লোকদিগকে উচ্চ ও নীচ মনে করে। বাস্তবিক ধর্ম্ম ও সত্য রক্ষা পূর্ব্বক মনুষ্য যে কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করুক, ব্রহ্মাণ্ডবেদ বা ঐশ্বরিক নিয়ম অনুসারে

তাহা উচ্চ ও নীচত্বের কারণ নহে। প্রতিবিম্বিত অপরজ্ঞান তাহা উচ্চ বা নীচ বলিয়া স্বীকার করে না। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি বা উপজীবিকা অধ্যাপন, অধ্যাপনা। এরূপ বিমলা বৃত্তিসেবক বিপ্রও যদি কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হয়, তবে সে বিপ্রও নীচত্ব লাভ করিয়াছে, ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি কেহ দৈহিক, সামাজিক অথবা কোন প্রকার পদপদার্থের বলে তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে রাজনিয়ম পালন না করিয়া রাজা স্বীকার করাও যেরূপ, আর ঈশ্বর স্বীকার করাও তাহার পক্ষে তদ্রূপ। ঐশ্বরিক নিয়ম অনুসারে উচ্চ ও নীচত্ব বিচার করিলে, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, সে ব্যক্তি পরের মোট বহন করিলেও কামক্রোধাদির ক্রীতদাস রাজা ও রাজমন্ত্রী হইতেও উচ্চ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

জাতীয় ব্রাহ্মণগণ ঋষিবাক্য, ষট্‌কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া এবং তাহার পরিবর্ত্তে ষড়রিপুর দাসত্ব করিয়া ক্রমান্বয়ে যে নীচত্ব লাভ করিতে লাগিলেন, সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যাহাতে শূদ্রাদি সাধারণ জাতি, কৃতদোষের কোন উল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদের চরণপূজা করে, এবং যাহাতে সত্ত্বগুণ লাভ করিতে না পারে, তন্নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; এবং ঋষিবাক্য মূলসূত্রের ভাবান্তর ও রূপান্তর করিয়া নানা প্রকার উপনিয়মাদিও বিধিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু কামক্রোধাদির আতিশয্যে সত্ত্বগুণের বিকারই যে নীচত্ব, তন্নিমিত্ত জগদ্‌গুরু মহাদেব শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন এবং সেই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া নারায়ণ দেবের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অংশাবতার শ্রীব্যাসদেব যাহা পুরাণাদিতে লিখিয়াছেন, সেই বেদবাক্যের প্রতিরোধ করিতে কাহার সাধ্য আছে ? একদিকে সত্ত্বগুণ বিকারগ্রস্ত হইয়া অন্য দিকে রজঃ ও তমোগুণ শুভকার্য্য ও বিদ্যার প্রভাবে

সত্ত্বগুণে পরিণত হইয়া সঙ্করের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, ব্রাহ্মণগণের দাসস্বরূপ ষড়রিপুর দাসত্ব স্বীকার। দ্বিতীয় কারণ, আপনার অপেক্ষা হীনজনের দাসত্ব স্বীকার এবং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে হীনজনের কন্যা গ্রহণ।

রাজবিপ্লবে বেণ রাজার সময়ে যে সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হয়, ব্রাহ্মণ-জাতি তাহা নিবারণ ও সঙ্করগণের শ্রেণীভেদ করিয়া দিলেন। কিন্তু ঐশ্বরিক নিয়ম বা ব্রহ্মাণ্ডবেদই অব্যর্থ ও অনাহত সত্য। মনুসন্তান মানবের নিয়ম অব্যর্থ, অনাহত ও নিত্য নহে; বিশেষ, তাহা একবার আঘাত প্রাপ্ত হইলে নিয়মকর্তৃগণ যতই নিয়মের পর নিয়ম করিয়া তাহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে যত্ন করেন, তাহা মাখাল ফলের ন্যায় উপরে সুন্দর ও চাকচিক্য বোধ হয় বটে, কিন্তু মূল পদার্থ সারশূন্য হইয়া যায়। বেণরাজা ব্রাহ্মণজাতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হউন; কিন্তু তাঁহার কর্তৃক নিয়মভঙ্গ মনোভঙ্গের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল; অর্থাৎ বেদবাক্য লঙ্ঘন করিলে তাহার যেমন অবশ্যম্ভাবী ফল, ব্রাহ্মণ জাতির শাসন লঙ্ঘন করিলেও তদ্রূপ প্রতিফল পাইতে হয় বলিয়া লোকের যে বিশ্বাস ছিল, তৎপ্রতি আর তাহা থাকিল না। সুতরাং শাসনভয়ে লোকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকলই হইতে লাগিল। অপ্রকাশ্যে বা গোপনে জাতীয় ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ্য শাসন যত অতিক্রম করিতে সাহসী হইলেন, ক্রমেতর জাতিরা তদ্রূপ সাহসী হইল না। জাতীয় ব্রাহ্মণগণের ষড়রিপু-সেবার পথ যতই পরিষ্কার হইতে লাগিল, তাহাদিগের প্রাণস্বরূপ নিত্যকর্ত্তব্য বা ষট্‌কর্ম্ম দেশ ছাড়িয়া পলায়নপর হইল। যাহারা সত্ত্বগুণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া রজঃ ও তমোগুণের সেবা করিতে লাগিল, তাহারা তদ্রূপ নীচত্ব, এবং যাহারা তমঃ ও রজোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বগুণের অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণের সেবা করিতে নিযুক্ত থাকিল, তাহারা ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে সমর্থ হইল।

যজ্ঞসূত্রাদির ন্যায় কোন বাহ্যচিহ্নের অসদ্ভাব উক্ত উন্নতিকে অবরুদ্ধা করিতে সমর্থা হইল না। প্রকৃতির গুণানুসারে কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। প্রকৃতির গুণানুসারে এই প্রকার উন্নত অর্থাৎ দধি হইতে দুগ্ধে পরিণত, লোকের সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাদের উন্নত ভাবও তদ্রূপ অল্প লোকেরই বিদিত ছিল। আবার যাহারা রজঃ ও তমোগুণের আধার হইল, তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

জাতিভেদের কথা উপলক্ষে উপরিউক্ত মন্তব্য হয় ত কাহারও নিকট আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পরিবেন যে, জাতিভেদের মূলতত্ত্ব উপরিউক্ত কথাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথের কথা এখনও অনেক আছে; আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহার কথা অনুসরণ করিতেছি।

কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রহ্মাণ্ডবেদে বলিয়াছেন, রাজা বেণ ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থাপিত বৈবাহিকতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা না করিয়া তাহা লোকের স্বেচ্ছাধীন করিয়া দিলেন। যাঁহারা জাতিভেদ পৃথিবীর অবনতির কারণ মনে করেন, তাঁহারা রাজা বেণের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট; এবং যাঁহারা তাহা উন্নতির হেতু বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু উপস্থিতকালে জাতিভেদের যে অর্থ ও পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে ইহা তদ্রূপ অহঙ্কারদুষ্ট ছিল না। **গুণের মর্য্যাদা রাখিতে ধর্ম্মরাজ্যে সদ্‌গুণের তারতম্যানুসারে জ্ঞানিগণ কর্তৃক মানবগণের যে শ্রেণীভেদ, তাহাই জাতি নাম ধারণ করিয়াছে। অতএব জাতি গুণজন্য।** যাহা জন্য, তাহা ধ্বংসশীল; এই নিমিত্ত জাতির উৎপত্তি ও নাশ আছে; এবং তমঃ ও রজো-

গুণাতীত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অর্থাৎ পরমার্থ সাধনভজনে কোন প্রকার শ্রেণী-ভেদ বা জাতিভেদ নাই। কেন না, যেহেতু জাতি থাকিলে তৎসঙ্গে অহঙ্কার থাকিবেই থাকিবে। আবার, অহঙ্কার থাকিলে পরমার্থ সাধন ভজন হইতে পারে না। এই কারণে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র পরমার্থ সাধনভজনে কোন প্রকার শ্রেণীভেদ বা জাতি স্বীকার করেন নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তৃতীয় উল্লাসের ৯১।৯২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "যদি নীচ জাতীয় লোকের অন্নও হয়, কিন্তু যদি তাহা ব্রহ্মসমর্পিত হয়, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণেও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে। পর-ব্রহ্মের মহাপ্রসাদ ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না। যিনি এই মহাপ্রসাদ (নীচ জাতির স্পর্শে) অশুদ্ধ বোধ করিবেন, তিনি মহাপাতকী হইবেন।" তবে সামাজিক ধর্ম্মে তাহা স্বীকার ও তাহার শাসনবাক্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অর্থাৎ **যেখানে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য নাই, রজঃ ও তমোগুণের সম্পূর্ণ প্রাধান্য, তথায় শ্রেণী বা জাতিভেদের যেমন প্রয়োজন, শাস্ত্রে তদ্রূপই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।** উক্ত প্রকারের ব্যবস্থা সমাজনীতির যাদৃশী মঙ্গলদায়িনী, তাহার ব্যভিচার তাদৃশ অপকারক। ব্যভিচার প্রধানতঃ দুই প্রকার। প্রথম, পরমার্থ সাধনভজনে জাতিভেদ। গুণানুসারে উন্নতি ও অবনতির স্রোত রুদ্ধই দ্বিতীয় ব্যভিচার মধ্যে গণ্য।

তাহার পর কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন, "গুণই শ্রেণী বা জাতি-ভেদের কারণ, এ কথা যদি বুঝিয়া থাক, তবে এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ব্রাহ্মণ কি? যিনি গুণময় দেহে অবস্থান করিয়াও পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় গুণাতীত, তিনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং যে স্থলে গুণ নাই, সে স্থলে জাতিভেদ কিরূপে হইতে পারে? অতএব, ব্রাহ্মণ কোন জাতি নহে।

ব্রাহ্মণের সন্তানগণ গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে প্রকারে বিভক্ত হইয়াছেন, অন্য স্থানে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

"অজাতি ব্রহ্ম হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপে নানা জাতিতে বিভক্ত হইল, এস্থলে তৎসম্বন্ধে দুই একটি তত্ত্বকথা তোমাকে বলিতেছি। হিংস্রজন্তু সমন্বিত নিবিড়ারণ্যে সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে বন উপবনের বিচার না করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, পুরাণে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রাজা বেণ যদি অরণ্যের রজঃ ও তমোময় পুষ্পগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্ত্বময় পুষ্পবৃক্ষ উপবনে রোপণ করিতে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে বিপন্ন হইতেন না। কারণ, তাহা ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধ নহে। বৃক্ষের ন্যায় মনুষ্যও প্রথমতঃ অরণ্যবাসী, আমমাংস ও অযত্নসম্ভূত উদ্ভিজ্জাশী দিগম্বর ছিল। ক্রমান্বয়ে সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া পরিশেষে জনপদবাসী ও পক্কান্ন ও কৃষিজাত ফলশস্যাশী সাম্বর হইয়াছে। আরণ্য কুসুমের সুগন্ধে যেমন উপবন সুবাসিত হইয়া গৌরবান্বিত, সেইরূপ সত্ত্বগুণের নিমিত্তই জনপদের এতাদৃশ গৌরব। যেমন উদ্যানমালীর অযত্ন, অমনোযোগ ও আলস্যাদি নানা দোষে পুষ্পোদ্যানে কণ্টকবৃক্ষ ও বিষলতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ জনপদমালী ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দোষে জনপদে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য হইয়া জনসমাজকে কলঙ্কিত ও পীড়িত করে। সুগন্ধ ও সুস্বাদ আরণ্যপুষ্প এবং ফলকর বৃক্ষে যেমন উদ্যানের গৌরব ভিন্ন অগৌরবের কারণ হয় না, সেইরূপ যে কোন মনুষ্যে সম্বর্দ্ধিত সত্ত্বগুণে জনসমাজের উন্নতি ব্যতীত অপকার সাধন করে না। কিন্তু উদ্যানজাত কণ্টকাদিযুক্ত বৃক্ষলতা যেমন উদ্যানের অগৌরব ও বিনাশের কারণ, সেইরূপ জনসমাজে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যও তাহার কলঙ্ক ও অধোগতির নিদান।"

"আমি এতক্ষণ যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, যদি সরলভাবে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাক, তবে নিশ্চই বুঝিতে পারিয়াছ যে, কি

বনে কি উপবনে, যে স্থানে যে অবস্থায় সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদ ফলকর বৃক্ষের উৎপত্তি হউক, তাহা সকলেরই আদরণীয় ও গ্রাহ্য ; এবং কি উদ্যানে, কি অরণ্যে, যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় কণ্টক বৃক্ষ ও বিষলতা উৎপন্ন হউক, তাহাই অনাদরণীয়, অগ্রাহ্য ও ত্যজ্য। ইহাকেই ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে শ্রেণী বা জাতিভেদ বলিয়া থাকে। এই অব্যর্থ নিয়মের কোন প্রকার ব্যভিচার হইলেই উন্নতির মঙ্গলময় সোপানশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অবনতির অকল্যাণকর সোপানে পতিত হইয়া ক্রমে অধঃপাতে গমন করিতে থাকে। এখন তুমি এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলের সসাগর সপ্তদ্বীপান্তর্গত সমুদায় দেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ ; যে প্রথা ঐশ্বরিক নিয়মের অনুগামিনী না হইয়া ব্যভিচারিণী হইয়াছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যসমাজ দূরে থাকুক, জীবমাত্রেই অবনতি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।”

জাতিভেদ সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ আরও অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার অবতারণা করা গেল না। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদ হইতে যে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার মত বুঝিতে পারা যাইবে।

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—উপাসনা।

আমি অনেকবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি কাঙ্গাল হরিনাথের ব্রহ্মাণ্ডবেদ হইতে যখনই যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে যাই, যখনই যে কথার মীমাংসা-চেষ্টা করি, তখনই কাঙ্গালের রচিত কোনও না কোনও গানে সে তত্ত্বের সমাধান দেখিতে পাই। তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদে যে সকল গভীর তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা তাঁহার গানের মধ্যে আমি পাইয়া থাকি। গানের মধ্যেই আমি কাঙ্গাল হরিনাথকে স্পষ্ট দেখিতে পাই, তাঁহার কথা বিশদভাবে বুঝিতে পারি। সেই জন্যই যখন তখন, যেখানে সেখানে তাঁহার গানের কথাই আমার মনে পড়ে এবং সেই গান উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারি না। এবার উপাসনা সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথের উপদেশ লাভ করিতে গিয়া প্রথমেই তাঁহার একটি গান আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই গানটি এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের আরম্ভ করিতে চাই।

গানটি এই—

"তাঁরে পাবিনে কখন ওরে ওমন,
নাহি থিতালে।
ওরে তোর হৃদয়-জল বড় ঘোলা,
ঢেউ উঠায় বাতাস তুলে॥ (সংসার মেঘে)

দেখ দেখি মন সেই কথা মনে,
ওরে, নিজান জলে মুখ দেখা যায়
সকলেই জানে ;
আবার পাড়ি-ভাঙ্গা ঘোলা পাঙ্গা
দেখা যায় কি সেই জলে ॥ (আপনার মুখ)
স্থির ভাবে মন থাকরে বসিয়ে
যত কাদামাটী ক্রমে রে তোর যাবে নিজায়ে ;
তখন নিজের ঘরে, সরোবরে,
দেখা পাবি ভাবিলে ॥ (নির্ম্মল জলে)
নড়িস্‌নে মন, টলিস্‌নে রে আর,
ওরে সংসার-মেঘে সদা আছে বাতাসের সঞ্চার ;
তুমি ঠিক না থাকলে, চঞ্চল হলে,
দেখ্‌বে আঁধার চোক বুজ্‌লে ॥ (ঘোলা জলে)
কাঙ্গাল কয় সংসার-বাসনা
আমার ঘোলা জল, ঘোলা করে, থিতাতে দেয় না ;
আমার ঘোলায় ঘোলায় দিন কেটে যায়,
হোল না মোর কপালে ॥ (জলে মুখ দেখা)

আমার ত মনে হয় উপরে যে গানটি তুলিয়া দিলাম তাহাতেই আমার বক্তব্য বিষয় কাঙ্গাল অতি সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন, ইহার উপর আর কিছু না বলিলেও চলিত। তবুও অতি সংক্ষেপে উপাসনাসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা নিবেদন করিতেছি। একথা বলিয়া রাখা ভাল যে আমি যাহা বলিব, তাহা কাঙ্গালের শিক্ষা মতই বলিব। তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, এ ক্ষেত্রে তাহাই আমার সম্বল।

ভগবানের উপাসনা ও পূজা এক কথা নহে। অগ্রে উপাসনা তাহার

পর পূজা। উপাসনা শব্দের অর্থ কি? সোজাসুজি বলিতে গেলে উপাসনা শব্দের অর্থ নিকটে উপবেশন। বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে দর্শন এবং এই তিনি আমার নিকট বসিয়া আছেন, ইহার স্পষ্ট অনুভূতিই উপাসনা।

উপাসনা সকলেরই এক প্রকার। ইহাতে মতভেদ বা মতদ্বৈধ নাই এবং আমার মনে হয়, থাকিতেও পারে না। আমার পিতা, আমার দেবতা, আমার আরাধ্য ধন আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া বা তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার নিকট বসিয়া আছি—ইহাতে আমার এক মত এবং অপরের অন্য মত হইবার কোন কারণ নাই। এ জগতে যাঁহারা ভগবানের নিকটে বসেন, তাঁহাদের সকলেরই অবস্থা একরূপ। তবে এ কথা ঠিক যে, সকলের উপাসনার প্রণালী একরূপ নহে—নানা জনের নানারূপ। আর এই নানারূপ প্রণালী হইতেই জগতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বা আবির্ভাব। তাহাতে যায় আসে না। নদনদী যেমন নানা দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে সাগরে প্রবেশ করে, উপাসনা-প্রণালীও সেই প্রকার ভগবানরূপ অমৃত-সাগরেই প্রবেশ করিয়া থাকে। নদনদীর মুখ বদ্ধ হইলে যেমন জল সাগরে পতিত হয় না, নানা স্থানে আবদ্ধ হইয়া দুষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ উপাসনা-প্রণালী উপাসনা-সাগরে পতিত না হইলে তাহার কার্য্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। দুষ্ট জল যেমন মনুষ্য জীবনের অপকারী, উপাসনা-প্রণালীর দুষ্ট কার্য্যাদিও লোকের পক্ষে তেমনই অনিষ্টকর হইয়া থাকে। পৃথিবীর সকল নদনদীর জল যেমন একই প্রণালীতে বহাইয়া সাগরে লইয়া যাওয়া অসম্ভব, তেমনই সমস্ত উপাসনাপ্রণালী এক করিয়া সেই ভূমা মহাসাগরে প্রবাহিত করাও অসম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহা কখনও

কোথায়ও হয় নাই, হইতে পারে না। প্রণালীগুলির জল সাগরে মিশিতেছে কি না, তাহারই আলোচনা করা, এবং প্রণালীর মুখ বদ্ধ হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার উপায় উদ্ভাবন করা মনুষ্যের সাধ্য, সুতরাং কর্ত্তব্য।

কাঙ্গাল হরিনাথ বলেন "কেহ উচ্চতল মন্দিরে, কেহ গৃহে, কেহ গুহায়, কেহ পর্ব্বতে, কেহ বনজঙ্গলে, কেহ বা নদীতীরে ও বৃক্ষতলে উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ সিংহাসনে বা কাষ্ঠাসনে, কেহ কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, কেহ গালিচা তুলিচা মাতুর বিছাইয়া, কেহ মৃত্তিকায় বসিয়া, কেহ যোগাসনে, নানাসনে, কেহ স্বেচ্ছাসনে, কেহ তুইপদে, কেহ এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ জানু পাতিয়া বসিয়া, কেহ উর্দ্ধ হস্তে, কেহ মুদ্রিত নেত্রে, কেহ মননে, কেহ বচনে, কেহ বা অন্য প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। এ সকল প্রণালী, ইহা উপাসনা নহে। উপাসনা তাঁহার সমীপে উপবেশন করা। যিনি তাহা করিয়া থাকেন, তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করুন না কেন, কৃতার্থ হইয়াছেন। যিনি তাহা করিতে পারেন নাই, তাঁহার নানাবাদ্যসমন্বিত ও দীপালোকে আলোকিত মন্দির, শৈবশাক্ত সন্ন্যাসীর বেলতলা, বৈষ্ণবের তুলসীতলা, ফকিরের আস্তানা ও দরগাতলা প্রভৃতি সকলেরই এক দশা। এটা কিছু নহে, ওটার প্রয়োজন নাই, সেটা নিরর্থক, এই সকল বাহিরের কথায় পরস্পর বিবাদ করিয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্মের নামে দলবদ্ধ করা জ্ঞানী মনুষ্যের পক্ষে অনুদারতা। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া যিনি উপাসনা করিতে পারেন অর্থাৎ ভগবানের সমীপে বসিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে সেই প্রণালীই অমৃত। আর যিনি তাহা না পারেন, তাঁহার পক্ষে সকল প্রণালীই মৃত।

সোজা কথা এই যে, চিত্ত স্থির করিতে হইবে! কি উপায়ে যে কাহার চিত্ত স্থির হয়, তাহার যখন কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই, তখন আমার প্রণালী

শ্রেষ্ঠ, অন্যের প্রণালী কিছুই নহে, ইহা প্রমাণ করিতে তর্ক বিতর্ক ও বিবাদ করা অজ্ঞতার কার্য্য। যাহাতে যাহার চিত্ত স্থির হয় এবং ভগবানের সামীপ্য লাভ হয়, তাহাই তাহার পক্ষে প্রাণের ধন ও জীবনের বস্তু। যিনি অবলম্ব্য প্রণালীর মুখবন্ধ দেখিয়া প্রণালীস্থ সাধককে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি বহুদর্শন আচার্য্য ও গুরু নহেন, তিনি দল বাঁধিবার গুরুঠাকুর। এই প্রকার প্রণালী পরিবর্ত্তনে অনেকে উভয় কূল হারাইয়া একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। এই শুষ্কতা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিলেই লোকে হয় স্বেচ্ছাচারী, না হয় নাস্তিক হইয়া উঠে।

কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়াছেন, প্রণালী যেমন উপাসনা নহে, উপাসনার অবলম্বন; সেইরূপ ভগবানের নামও ভগবান নহেন, ভগবান প্রাপ্তির সহায় স্বরূপ। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এবং আপনার হৃদয়ানুসারে প্রণালীর মত এই নামও লোকে অবলম্বন পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকে! যিনি যে নাম অবলম্বনে সামীপ্য সিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন, সেই নামই তাঁহার মূলমন্ত্র, উপাস্য-দেবতা-স্বরূপ এবং হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন। সাধকের এই অবস্থায় নাম ও নামী এক হইয়া যায়।

কাঙ্গাল বলেন "ভাষা ও বাক্যের এমন কোন শক্তি নাই যে, সে ভগবানকে প্রকাশ করিতে পারে। যখন সাধকের সাধন-শক্তি বাক্যে ও শব্দে প্রবেশ করে, তখন অপ্রাণ বাক্য ও শব্দ সকলও প্রাণশক্তি পাইয়া জীবন্ত হইয়া উঠে। এইরূপ জীবন্ত বাক্য ও শব্দের নামই মন্ত্র। চুম্বক-পাথর স্পর্শ করিয়া লৌহ যেমন তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাক্য ও শব্দ সকলও ভগবানকে স্পর্শ করিয়া শক্তিলাভ করিয়া থাকে।"

আমাদের মনে হয় এই প্রকার শক্তিসম্পন্ন বাক্যকেই সিদ্ধবাক্য বা সিদ্ধশব্দ বলে। সিদ্ধপুরুষগণ এই সিদ্ধবাক্য অন্যকে প্রদান করেন;

ইহারই নাম গুরুমন্ত্র। এখন অনেকে গুরুমন্ত্র বিশ্বাস করেন না, কারণ তাঁহারা দেখিতে পান মন্ত্রে চেতনাশক্তি নাই! এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সত্য সত্যই এখন যাঁহারা গুরুপদবাচ্য তাঁহারা সিদ্ধমন্ত্র দিতে পারেন না। যিনি নিজে সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিতে পারেন নাই,তিনি যে মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিবেন, তাহাতে ত শক্তি থাকিবেই না। এখন তেমন সিদ্ধগুরু মিলে না, তাই মন্ত্রের শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। উপাসনালব্ধ যে বাক্য বা মন্ত্র, তাহা কি শক্তিহীন হইতে পারে? অনেকে বংশপরম্পরায় যে গুরুবংশের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে শক্তি কৈ? গুরুবংশের হয় ত কেহ কোন সময়ে উপাসনাবলে প্রাণের কথা বা মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার উত্তরাধিকারী মহাশয়েরা সেই মন্ত্র লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সে শক্তি লাভ করিলেন না; মন্ত্র অচেতন হইয়া গেল। ভবিষ্যবংশীয় গুরুপুত্র পৌত্রগণ সেই অচেতন বা শক্তিহীন মন্ত্রই শিষ্যগণকে দান করিতে লাগিলেন; সুতরাং সে মন্ত্র কার্য্যকরী হইল না। মন্ত্রের ফল লাভ করিতে না পারিয়া লোকের মন্ত্রের প্রতি এবং মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইতে লাগিল; অবশেষে শিষ্য স্বেচ্ছা-চারী বা নাস্তিক হইয়া উঠিল।

উপাসনার কথা বলিতে বলিতে আমরা বোধ হয় সামান্য একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এক্ষণে পুনরায় উপাসনার কথা বলিতেছি। যাঁহারা ভগবানকে অস্বীকার করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে স্বীকার করিয়াও উপাসনা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতেছি না। যাঁহারা প্রণালী অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন "কৈ, কিছুই ত পাই না, কিছুই ত বুঝি না।" এ কথার উত্তর এই যে, তাঁহারা উপাসনা করেন না,

তাঁহারা প্রণালীর দাসত্ব করেন। লোকে যতদিন প্রণালীর দাস হইয়া কেবল কতিপয় অনুষ্ঠান মাত্র করে, ততদিন সে উপাসনা করে না। হৃদয় পরিষ্কার না করিয়া প্রণালীগত উপাসনা ও কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কখন ভগবানের দর্শন লাভ ত হয়ই না, বরং অবিশ্বাসের দৃঢ়তা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আমরা ভগবানের প্রকৃত উপাসনা করি না, কেবল বাহ্য-অনুষ্ঠানকেই উপাসনা মনে করিয়া থাকি, সুতরাং, উপাসনাতে প্রকাশ দেখিতে পাই না। বাস্তবিক আমরা কি মনে করি? আমরা সম্মুখে পূজার সজ্জা রাখিয়া অথবা বাদ্য-গীতের অনুষ্ঠান করিয়া কতকগুলি অভ্যস্ত মন্ত্রোচ্চারণে মৌন হইয়া অথবা নয়ন মুদিয়া কাম কল্পনা ও বাসনার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তাহাদেরই স্তব পাঠ করিতেছি। এই যে ব্যবসায়বাণিজ্য আমার হৃদয়মধ্যে অট্টহাস্য করিতেছে, এই যে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সংসার আসিয়া আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, এই যে মান সম্ভ্রম আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে চরণ অগ্রসর করিয়া দিতেছে, এই যে ধন-জন, বিদ্যা-জ্ঞান, জাতি-কুল, রূপ-যৌবন প্রভৃতির অহঙ্কার সপরিবারে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে; আমি তাহাদেরই উপাসনা করিতেছি, তাহাদেরই চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। যাহাদিগের উপাসনা করিতেছি, তাহারাই আমার সমীপে রহিয়াছে, আমি তাহাদিগের নিকটেই আছি। উপাসনায় এত বাধা বিঘ্ন থাকিলে ভগবানের উপাসনা হয় না।

এ কথা যে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। সিদ্ধ-সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ সে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই উপায়ের কথা বলিবার বা উপদেশ করিবার অধিকার আমি লাভ করি নাই। জন্মজন্মান্তরেও করিতে পারিব কি না, জানি না। তবে কাঙ্গাল হরিনাথ যাহা বলিয়া-

ছেন, তাহারই আবৃত্তি করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, "বিক্ষিপ্তচিত্তকে সংযত করিবার, সংসারাভিমুখী মনকে ভগবানাভিমুখী করিবার একমাত্র উপায় যোগ এবং একমাত্র সহায় সদ্‌গুরু।" সদ্‌গুরু সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে নিবেদন করিয়াছি; যোগের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী প্রস্তাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

[১৩]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—যোগ।

আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে যোগের কথা বলিয়াছিলাম। যোগ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; তবে ব্রহ্মাণ্ড-বেদে কাঙ্গাল হরিনাথ কোন কথাই বাদ দেন নাই; সাধনবলে তিনি যাহা কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যোগের কথা এই স্থানে নিবেদন করিব।

প্রথম বুঝিতে হইবে 'যোগ' কথাটার অর্থ কি? কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়াছেন "মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম যোগ।"—আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন "ত্যাগ-স্বীকারই যোগের হেতু।" কথাটা বোধ হয় এই—বিষয়বুদ্ধি ও বিষয়নাশের নিমিত্ত যে অবস্থায় সুখ দুঃখের অনুভব হয় না, মানুষের সেই অবস্থার নামই যোগ। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার উপায় যে সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহার নাম যোগশাস্ত্র।

সুখ-দুঃখানুভবের কারণই মন। আধেয় মন যখন সুখ-দুঃখের হেতু বিষয় পরিত্যাগ এবং ভগবান অথবা তাঁহার মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকে আশ্রয় করে, তখন জীবের যে অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই অবস্থার নাম যোগ। অতএব যোগ যত্নশীল গৃহস্থের পক্ষেও দুর্ল্লভ নহে, এবং অযত্নশীল সন্ন্যাসীর পক্ষেও সুলভ নহে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় আছে—"হে পাণ্ডব! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ বলিয়া জানিও; যিনি ফলসঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি

কর্ম্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও যোগী হইতে পারেন নাই।" গীতার অন্য একস্থলে লিখিত আছে

"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা।

"সেই দুঃখ মিশ্রিত বৈষয়িক সুখদ্বারা নিযুক্ত অবস্থা-বিশেষের নামই যোগ বলিয়া জানিবে। সেই যোগকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।"

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় পাতঞ্জলদর্শন-বঙ্গানুবাদের অবতরণিকায় লিখিয়াছেন—"মন্ত্রযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, তত্ত্বদর্শী যোগীরা এই চারি প্রকার যোগপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চতুষ্পথাকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাযোগীর দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ফল কথা এই যে, প্রত্যেক যোগেই লয়ের সম্বন্ধ আছে। লয় ছাড়া যোগ হয় না। লয় কি? কাহার লয়? চিত্তের লয়। চিত্ত কোন এক অনির্দ্দেশ্য আকারে লয় প্রাপ্ত হইলেই তদ্দশায় তাহাকে লয়যোগ বলা যায়।"

হঠযোগের দ্বারা শরীর নিরুগ্ন ও সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহিষ্ণু হইয়া থাকে। তন্নিমিত্তই অধ্যাত্ম-যোগিগণ অধ্যাত্ম-যোগানুষ্ঠানের পূর্ব্বে হঠযোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, কি আধ্যাত্মিক, মানবশরীর সর্ব্বপ্রকার যোগ-সাধনেরই মহাযন্ত্র। সাধন করিবার সর্ব্ব প্রকার উপায় বা কলকৌশলই এই যন্ত্রের সর্ব্বস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, সুতরাং যন্ত্ররূপ শরীর ভগ্ন ও তাহার স্বভাব বিকৃত না হইলে তদবলম্বনে শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার সাধন করিয়াই কৃতার্থতা লাভ করা যায়। শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইলে কোন প্রকার যোগসাধন

করিয়াই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব হঠযোগই সকল যোগের প্রথমাঙ্গ বা সোপান। বাল্যকালই এই যোগশিক্ষার উপযুক্ত সময়। ইহার পর শিরা ও অস্থি প্রভৃতি যতই দৃঢ় হইতে থাকে, লোকে হঠযোগ শিক্ষা করিতে ততই অপরাগ হয়। প্রৌঢ়াবস্থায় উক্ত যোগ কাহারও অবলম্ব্য নহে। সেকালে গুরুগৃহে ছাত্রগণ এই হঠযোগ অভ্যাস করিত, ইহা পাঠেরই একটি অঙ্গ ছিল। যে দেশের লোকে যত যত্ন সহকারে একান্ত হইয়া এ যোগের সেবা করিয়া থাকে, তাহারা ততই শিল্প বাণিজ্য ও অপর বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। যাহারা শিল্প-যন্ত্র ও অর্ণবযান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে নিপুণ নহে, তাহারা উক্ত বিষয়ে যোগভ্রষ্ট হইয়া বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারে না। যাহাদিগের কৃষি-যোগ ব্যভিচারযুক্ত, তাহারা অন্নের সচ্ছলতা লাভে বঞ্চিত থাকে।

যোগ সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ অনেক তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, এ স্থলে তাহার সারোদ্ধার করাও এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমি যদি এই স্থানে কাঙ্গালের একটি গান তুলিয়া দিই, তাহা হইলে কাঙ্গা-লের কথার আভাস সকলেই পাইবেন। কাঙ্গাল হরিনাথ গাইয়াছেন—

বিনা ইন্দ্রিয় দমন, না হয় কখন, কৃষ্ণসেবা সাধন ভজন।

১। যে জন হয় রিপুর অধীন, সেই ত দীন,
অধম বলে পণ্ডিত জন;
কাম ক্রোধের দাস হইয়ে, জ্ঞান হারায়ে,
ভ্রমণ করে মায়াকানন।

২। ইন্দ্রিয় বিষম বেদে, ফেলে ফাঁদে,
ভালুক করে মানুষ রতন;
নাকেতে ডুরি দিয়ে, নাচাইয়ে,
যথা তথা করে ভ্রমণ।

৩। ইন্দ্রিয় তুফান উঠে, হৃদয় তটে,

ঘোলা করে মানুষের মন ;

ঈশ্বরের তত্ত্ব না পায়,—ঘুরে বেড়ায়,

অন্ধকারে অন্ধ যেমন।

৪। কাঙ্গাল কয় ছাপাতিলক, বাহিরের যোগ,

মনের যোগ ইন্দ্রিয়-দমন ;

যদি রে তা—না—হ'ল, সব বিফল,

শ্রবণ মনন কীর্ত্তন।

যোগের প্রধান কথাটাই কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-বেদের একস্থানে কাঙ্গাল বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়-সংযমই অধ্যাত্মযোগ সাধনের প্রথম সোপান। যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, সে ব্যক্তি আত্মযোগ সাধন করা দূরে থাকুক, উক্ত যোগ কাহাকে বলে, তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয় নষ্ট করাই ইন্দ্রিয়-সংযমের অর্থ-তাৎপর্য্য বুঝিয়া ইন্দ্রিয় নষ্ট করিতে যত্ন করিয়া থাকে। লোকে যত্ন ও চেষ্টা করিলে ইন্দ্রিয়, সংযম-করিতে পারে, কিন্তু নষ্ট করিতে পারে না। কারণ, তাহা অবিনশ্বর পর-মেশ্বরী শক্তিবিশেষ। ইহার বিনাশ-সাধন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহার দ্বারা এই শক্তির প্রকাশ হয়, সেই দ্বার শরীরের বাহ্যাবয়ব, সুতরাং নশ্বর। লোকে কেবল তাহারই প্রকাশিকা শক্তি নষ্ট করিয়া মনে করে, ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়াছি। ইন্দ্রিয়-সংযম যোগের প্রথমাঙ্গ। কিন্তু সংযম না করিয়া লোকে যে ইন্দ্রিয় নষ্ট করিতে ইন্দ্রিয়-দ্বারের শক্তি নষ্ট কিম্বা অবয়ব ছেদন করে, ইহারই নাম যোগের ব্যভিচার। লোকের চেষ্টায় ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশিকা শক্তি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের শক্তি হৃদয়মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাকে এবং তুষানলের ন্যায় যন্ত্রণা দান করে। এরূপ ব্যক্তি সকল বাহিরে আবরণ দিয়া ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া লোকের নিকট সম্মানিত ও পূজিত

হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের রুদ্র মুখ ব্যতীত কখন প্রশান্ত মুখের আভাসও বুঝিতে পারে না। একান্তহৃদয় হইয়া ডাকিলে ভগবান পঞ্চমহা· পাতকীকেও দয়া করেন; কিন্তু তিনি এরূপ ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত বিমুখ। অতএব, এই প্রকারে যে ইন্দ্রিয়-সংযম, তাহা ইন্দ্রিয়-সংযমের বাচ্য না হইয়া যোগের ব্যভিচার শব্দেরই বাচ্য।

"ইন্দ্রিয়-সংযম লোকে এক্ষণে যেমন কষ্টকর ও দুঃসাধ্য মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা তাদৃশ কষ্টকর ও দুঃসাধ্য নহে। লোকে অবিহিত কার্য্য করিয়া অভ্যাসকে স্বভাবে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিতে ক্লেশকর ও দুঃসাধ্য মনে করে। এই অভ্যাস আবার দুই একদিনের নহে, জন্ম জন্মান্তরের। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সংযম লোকের পক্ষে ক্লেশকর ও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির যাহা কিছু বাহিরের কার্য্য, লোকে কেবল তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাহা করিতেও ভালবাসে। কেন না ইন্দ্রিয়-সংযম না থাকিলেও ঐ সমুদায় বাহ্যকর্ম্মের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; কিন্তু অধ্যাত্ম-সাধনে কোন এক ইন্দ্রিয় স্খলিত হওয়া দূরে থাকুক, চঞ্চল হইলেও সাধনপথে তিষ্ঠিয়া থাকা সুকঠিন। বাহিরের কার্য্য কেবল মন্দের ভাল অর্থাৎ যাহারা কিছুই করে না, তাহারা যতটুকু করে তাহাই ভাল; এবং ভক্তি সহকারে এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাহার দ্বারা অধ্যাত্ম-সাধনে উঠিবার প্রথম সোপান নির্ম্মিত হয়।

এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের অথবা এক আত্মার সহিত অন্য আত্মার একীভূত করিবার নাম যোগ। তাহা হইলে এ কথা বেশ বলিতে পারা যায় যে, ইন্দ্রিয়-সংযমের ফল যোগ; কেবল যোগ নহে, সর্ব্বপ্রকার যোগের, বিশেষ আত্মযোগের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ। ইন্দ্রিয়-সংযমের ফল যেমন যোগ, তদ্রূপ যোগের ফল ভগবানে অবস্থান ও তত্ত্বজ্ঞান। বৃত্তির

অনুগত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল বাহিরের নানা বিষয়ে নিযুক্ত থাকে ; তাহা হইতে তাহাদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিরোধ অর্থাৎ চিত্তস্থানে সংগৃহীত ও আবদ্ধ করিলে তৎপরে ভগবানের যোগ করিতে হইবে, ইহারই নাম ইন্দ্রিয়-সংযম যোগ। যতদিন এই প্রকারে ইন্দ্রিয়-সংযম যোগ সাধন না হয়, ততদিন আত্মযোগে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহারও হয় না এবং হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত আত্মযোগ সাধন ত হইতেই পারে না ; কিন্তু হঠযোগী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইলে তিনিও অনেক কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ বাহিরে সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহাকে সদাচার এবং অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহাকে অসদাচার বলে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ বলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ যে পর্য্যন্ত ভগবানে যুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সদসৎ যাহাতেই নিযুক্ত থাকুক, তাহাকেই অসংযম ব্যভিচার বলে। তবে ইন্দ্রিয়গণ সতে যুক্ত থাকিলে সমাজনীতি ও রাজনীতি অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে লোক দণ্ডার্হ হয় না, আর অসতে যুক্ত হইলে দণ্ডার্হ হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ।

এই স্থানে আর একটি কথার অতি সংক্ষেপে একটু আভাস প্রদান করিতেছি। উপরে যে ইন্দ্রিয়সংযম যোগের কথা বলিলাম, এই সংযম-যোগ জ্ঞানী ও ভক্ত যোগীদিগের ঠিক এক প্রকার নহে—কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ আছে। জ্ঞানীর প্রার্থনা "হে পরমপুরুষ, তোমার শক্তিতে আমার প্রতি ইন্দ্রিয় শক্তি সংযুক্ত হইয়া তোমার জগতের সেবা করুক।" প্রেমভক্ত তাহা বলেন না ; তিনি বলেন "তোমার প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ কাঁদে।"

ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বলিতে বলিতে আমরা জ্ঞানযোগ ও প্রেমভক্তি-যোগে আসিয়া পড়িয়াছি। কেমন করিয়া এ কথা উঠিল, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না ; তবে ইন্দ্রিয়-সংযম হইতে কথাটা যে না আসিতে

পারে, তাহা নহে। জ্ঞানযোগই হউক আর ভক্তিপ্রেমযোগই হউক, ইন্দ্রিয়-সংযম যে উভয় যোগেরই প্রথম ও প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সংযমের পথ না ধরিয়া সাধনভজন করিতে গিয়া যে কি হয়, তাহা তথাকথিত বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মাচরণে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এই ভূতের আড্ডায় বাস করিয়া ভূত ছাড়াইতে না পারিলে যে কোন দিকেই যাওয়া যায় না, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

এই স্থানে কাঙ্গাল হরিনাথের একটি গান আমার মনে পড়িল ; সেই গানটি উদ্ধৃত করিতেছি, গানটী এই—

ভূতের ঘরে বসত করা ভাই হ'ল রে দায় ;
জ্বলে মলেম পাঁচ ভূতের জ্বালায়।

১। আমি ভুলে ভূতের ঠাটে, ভূতের ব্যাগার খেটে,
ভূতের হাটে ভ্রমি ভূতের ভোগায় ;
ভূতের সকলই অদ্ভুত, ভূতে জন্মে ভূত,
ভূতে জড়ীভূত করলে আমায়।

২। এ যে ভূতেরই সংসার, ভূতেরই ব্যাপার,
ভূতে ভূত খায় ভূতের জ্বালায় ;
কিছু নহে ভূত ছাড়া, ভূতে ভূত বেড়া,
ভূতের সঙ্গে ভূত নেচে বেড়ায়।

৩। ওরে কাঙ্গাল কেঁদে কয়, পঞ্চভূতময়,
দেহে আবার ষড়ভূতে জ্বালায় ;
এখন বল রাম রাম মুখে অবিরাম,
হবে প্রাণরাম নাম মহিমায়।

[১৪]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—যোগতত্ত্ব।

এইবার আমি যোগতত্ত্বের কথা বলিব। এ সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই। আমি সেই পন্থাই অবলম্বন করিলাম।

কর্ম্মযোগ।

কাঙ্গাল হরিনাথ বলেন—যাগযজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়াকে কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্মের যোগেই এ সংসারে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কর্ম্ম ব্যতীত জীব অন্য কার্য্য দূরে থাকুক, স্বীয় দেহযাত্রা পর্য্যন্তও নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, কর্ম্মাত্মিকা প্রবৃত্তির বাধ্য হইয়া প্রাকৃতিক জীব কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। কোন সৌধশিখরে আরোহণ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে তাহার সোপান আশ্রয় না করিলে যেমন সে মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; তদ্রূপ যে কোন যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম-যোগমালা আশ্রয় ব্যতীত জীবের সে ইচ্ছা সফল হইবার উপায়ান্তর নাই। স্রোতের তীরে অবস্থিত পারাপারের তরণীখানি স্বয়ং জড় ও অচল হইলেও পারান্তর গমনেচ্ছু অজড় ও সচল জীবকে নিজ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক যেমন নদীপার করিতেছে; সেইরূপ কর্ম্মযোগ স্বয়ং অচল ও জড়বৎ হইলেও ভবসাগর-তিতীর্ষু জীবগণকে নিজ বিস্তৃত বক্ষে স্থান দান করিয়া অনায়াসে ভবসাগরের পারান্তরে

উপস্থিত করিতেছে। অতএব লোকে যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যথাবিধি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই কর্ম্ম-যোগ অবলম্বনেই সকল যোগের অমূল্য ধন যোগেশ্বরকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে এই কর্ম্মযোগ আবার তিন প্রকার। যে কর্ম্ম আসক্তি ও ফললাভেচ্ছাশূন্য হইয়া ও সমাজের মান সম্ভ্রম প্রভৃতি স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত রূপে অনুষ্ঠিত না হইয়া কেবল বিধি বিধানের অনুসরণে দম্ভ-বিরহিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ফললাভের ও আসক্তির কারণ রূপ এবং সামাজিক মান সম্ভ্রম ও রাজ্যাদি লাভের নিমিত্ত রূপে দম্ভসহকারে ধূমধামে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে রাজসিক কর্ম্ম বলে। আর যে কর্ম্ম বিধি বিধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবী শুভাশুভে লক্ষ্যশূন্য হইয়া এবং সামাজিক মান সম্ভ্রম যশ আদর অপেক্ষা না করিয়া মোহবশতঃ বিধিবিরুদ্ধ হিংসাবলম্বনে সদম্ভে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই তামসিক কর্ম্ম বলে।

কাঙ্গাল আরও বলিয়াছেন—ভোজন, গমন, হবন, দান ইত্যাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমুদায় কর্ম্মই যদি ভগবানে অর্পিত হয়, অর্থাৎ ইহার কিছুতেই আমার ফললাভের আশা নাই, ভগবানেরই প্রীতির নিমিত্ত বা তাঁহার কার্য্যসাধনের জন্য ইহার অনুষ্ঠান করিতেছি, এই জ্ঞানে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে। এই সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল কর্ম্মজন্য শুভাশুভ নাশ ও পরমপদ লাভ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৯ম অধ্যায় ৪৭ ও ৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা—‘হে কৌন্তেয়, তুমি ভোজন, হবন, দান বা তপস্যা প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ কর। এরূপ করিলে তুমি কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে। (আমার প্রতি সমর্পণরূপ) যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।”

ভোজন, তীর্থগমন, দান, তপস্যা প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম ফলাভিলাষ-যুক্ত হইয়া অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিতেছি, ইহার দ্বারা আমার অক্ষয় স্বর্গ-সুখলাভ হউক ইত্যাদি সকাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে। এই রাজস কর্ম্মের ফল পুণ্যসঞ্চয় ও স্বর্গলাভ এবং পুণ্যক্ষয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ। এইরূপ সংসারে যাতায়াত করাই রাজস কর্ম্মের সুখদুঃখময় ফলভোগ।

তামস কর্ম্মানুষ্ঠায়িগণ ভগবানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশু ফল লাভের আশায় তামস কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিরূপে কর্ম্মফলে বঞ্চিত হয়, ও কিরূপ প্রকৃতির আশ্রয় করিয়া ভগবানকে অবজ্ঞা করে, তাহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতায় ৯ম অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে ভগবান নিজেই বলিতেছেন –"তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে আশুফলপ্রদ বলিয়া আশা করে, কিন্তু তাহাদিগের আশা বিফল হয়। কারণ মৎপ্রতি বিমুখ হওয়াতে তাহা-দিগের কর্ম্মসকল ফলজনক হয় না। বিফলজ্ঞানযুক্ত সেই ব্যক্তিরা রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।"

ধ্যান-যোগ।

সাংসারিক বিষয়চিন্তা হইতে শূন্য করিয়া পরব্রহ্মের মহিমাতে চিন্তা-প্রবাহ প্রবাহিত করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করাকেই ধ্যান বলে। এই ধ্যান অভ্যাসের পূর্ব্বে মনন অভ্যাস করিতে হয়। পরব্রহ্মের অস্তিত্বে ধ্রুব বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার গুণ ও মহিমাতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনুক্ষণ মনে মনে শাস্ত্রীয় যুক্তি, তর্ক ও বিচার উত্থাপন পূর্ব্বক যে মীমাংসা তাহাকেই মনন বলে। এই মননের পরিণাম-ফলই ধ্যান। ধ্যান যতই গাঢ় হইতে থাকে, পরব্রহ্ম-তত্ত্বও ততই হৃদয়ফলকে নির্ম্মলা-

কাশে আদিত্যমণ্ডল প্রকাশের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ধ্যানের পূর্ব্বে যে সমুদায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদায় সৌধশিখরারোহণের নিম্ন-সোপানমালার ন্যায় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের নিতান্ত অন্তরঙ্গ হইলেও ধ্যান হইতেই পরব্রহ্মত্ব হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইয়া সাধককে আপনার অভিমুখে আপনি অগ্রসর করিতে থাকে। এই ধ্যানাবস্থায় সাধক সাংসারিক শত সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যে পড়িলেও সেই ধ্যেয় ধ্যানে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন না। কারণ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, যাহাকে সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বসুখকর ও মধুর বলিয়া জানে, শত সহস্র বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলেও সে পদার্থের সম্ভোগে সে কথনই নিবৃত্ত হয় না। সাধক ধ্যানে যে আনন্দ, যে শান্তি, যে মধুরতা অনুভব করেন, তাহার নিকট সাংসারিক আমোদ প্রমোদ ও ধনজন স্ত্রী পুত্রাদি জন্য সুখ যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; তাই শত সহস্র বাধাবিপত্তি উপস্থিত হইয়াও সাধককে ধ্যানের অনুপম আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে কিছুতেই সাহসী হয় না। যোগীর ও ভক্ত সাধকের ধ্যানভেদে এই ধ্যানযোগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যোগিগণ সাংসারিক বিষয়ে চিন্তা হইতে মনের শূন্য ভাবনাকে ধ্যান বলেন এবং এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে সকলই অনিত্য, কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই নিত্যপদার্থ, এইরূপ অনুক্ষণ অনু-চিন্তন তাঁহাদের ধ্যানের কার্য্য। এই চিন্তার পরিণাম মনঃস্থৈর্য্যই যোগি-গণের ধ্যানযোগের অব্যর্থ ফল। আর, ভক্তহৃদয়রঞ্জন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান ভক্তির একান্ত আকর্ষণে আপনার গুপ্তস্বরূপ যে সকল নিত্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন, ভক্ত সাধকগণ সাংসারিক সমুদায় বিষয়চিন্তা হইতে মনকে হরণ পূর্ব্বক সেই নিত্য দেব বা দেবী মূর্ত্তির গাঢ় চিন্তা দ্বারা হৃদয়ে তৎ তৎ মূর্ত্তিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লীলা ও মহিমাতত্ত্বে চিন্তাপ্রবাহ প্রবাহিত ও অপার আনন্দ-

সুখ অনুভূত হওয়াকেই ধ্যান বলেন। এই ধ্যানদ্বয়ের বিষয় ও পরিণামফল আলোচনা করিয়া যোগিগণের ধ্যানকে লক্ষ্য করিয়াই ভক্ত যোগীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভগবানের একান্ত প্রিয় বলিয়া স্বয়ং শ্রীভগবানই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৭ম অধ্যায় ১৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "যোগযুক্ত আত্মজ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আমার ও আমি তাঁহার একান্ত প্রিয়।"

বিজ্ঞান-যোগ।

বিজ্ঞানযোগ সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ বলেন—এই জগৎ-সংসারে মায়ামুগ্ধ জীব সকল আপনার মায়ামুগ্ধতা অনুভব করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে আপনি আপনাকে জ্ঞানী জানিয়া অভিমানে অভিভূত হয়। শাস্ত্র যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "জ্ঞানাদেব হি মুক্তি স্যাৎ" —জ্ঞানই এ সংসারে মুক্তির কারণ, জ্ঞানই মায়াজন্য সুখ-দুঃখাদি যন্ত্রণা পরিহারের একমাত্র হেতু, ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান শব্দের যোজনা করিয়া দেন; মোহান্ধ মানব জীবের সাধারণ-জ্ঞানের সহিত তাহার ঐক্য সমাধান পূর্ব্বক অনেক সময়েই দুঃখ করিয়া থাকেন "আমি জ্ঞানী হইয়া সংসার-যন্ত্রণা অনুভব করি কেন? জীবমুক্ত হইয়া মায়াসন্দীপ্ত শোক-দুঃখানলে দগ্ধীভূত হই কেন?" এবং পরিণামে মীমাংসাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্রবাক্যকে মিথ্যা বলিতে ক্রুটী করেন না। সেই মায়ামুগ্ধ মানবকে সতর্ক করিবার জন্যই ত্রিজগন্মঙ্গল শাস্ত্র জীবের সাধারণ জ্ঞান হইতে বিশেষ করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে বিশেষ জ্ঞানে পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডময় পরম মহিমাতত্ত্ব সাধক-হৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞান-যোগ বলে। আহার নিদ্রা ভয় ও সন্তানোৎপাদনের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা এ জগৎ-সংসারে সৃষ্ট জীবমাত্রেই সমানরূপে

বিদ্যমান আছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ দেব দানব মানব বলিয়া তাহার কিছু-মাত্র ইতরবিশেষ নাই। জই জন্যই আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি বৃত্তি চরিতার্থতা জন্য নানা বুদ্ধিচাতুর্য্য উপস্থিত করিলেও তাহা সাধারণ পশুজ্ঞান হইতে উচ্চ বলিয়া গণ্য বা মান্য নহে। মানব যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ, বলের কাজ কলে সাধন, এবং প্রজাশাসন, প্রজারক্ষণ, বিদ্রোহিদমন ইত্যাদি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে, তাহা যে তাহার নিতান্ত মোহমুগ্ধতার পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পশু পক্ষী ও কীটদিগের যে প্রকার গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে শিল্পচাতুর্য্য, আহার সংগ্রহের জন্য কৌশল-বিস্তার ও রিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে দেখা যায়, তাহাতে মানব হইয়া শিল্প কল ও রাজকার্য্যে মানব যে বড় অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা নহে। এই সাধারণ বা অপর জ্ঞানের উচ্চ সীমা-রোহী মহাবাহাদুর কি সম্রাট, কি শিল্পি-চূড়ামণি, কি আধুনিক বিজ্ঞান-বিৎ, কাহারই মায়াজন্য রোগ শোক তাপ ও জরা মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি সংসার-ক্লেশ নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই। সাধারণ বা অপর জ্ঞানের সেবা করিয়া রাজা, মন্ত্রী, কি সম্রাট্ হইলেও মায়া-যন্ত্রণা পরিহার পূর্ব্বক প্রকৃত শান্তির বিমলানন্দ উপভোগ করিবার সাধ্য ইহ কি পর সংসারে কাহারও নাই। যেহেতু পাপ পুণ্য সচরাচরই অনুগামী হয়।

বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ জ্ঞান কাহাকে বলে? জল বলিয়া যে একটী পদার্থ আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ ও ব্যবহার করি, ইহার গুণ শীতলতা, কার্য্য পিপাসানাশ; এই পর্য্যন্তই সাধারণ জ্ঞানের অধিগম্য। তৎপর যে ইহার বিশেষ তত্ত্বগ্রহণ, তাহাই বিজ্ঞানের সূক্ষ্মদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত; যথা, এই শীতলগুণযুক্ত, জীবের পিপাসাশান্তিকারী জল কোথা হইতে আসিল? জীবের পিপাসানাশের প্রয়োজন জানিয়া কে ইহাকে এরূপ

স্বচ্ছ, তরল করিয়া সৃষ্টি করিল? এবং ইহার উৎপত্তির মূলই বা কি? ইত্যাদি রূপে অনুসন্ধান-বৃত্তি-প্রবাহ প্রবাহিত হইলে শাস্ত্রের বা শাস্ত্রবিদ্ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া ইহার শেষ মীমাংসায় একমাত্র জগৎকর্ত্তাই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত সৃষ্টির কারণ, তিনিই ইহার প্রয়োজন জানিয়া ঐ রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং জলের ধর্ম্ম যে শীতলতা তৎস্বরূপও তিনি, ইহা হৃদ্বোধ ও জগন্ময় প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার সত্তা অনুভব করাই বিজ্ঞানযোগের অব্যর্থ মধুর সিদ্ধফল। ইহা অপেক্ষা ইহার আরও সংক্ষেপ এই যে, ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক পদার্থের বাহ্যতত্ত্ব হইতে লক্ষ্য করাই বিজ্ঞানযোগের সমাধান। এই বিজ্ঞানযোগের সাধনায় অগ্রসর সাধকই ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডপতির সত্তা অনুভব পূর্ব্বক 'জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যাৎ' শাস্ত্রের এই অব্যর্থ সত্য বাক্যের মহদুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপে অবস্থিত হয়েন। বিজ্ঞানযোগসিদ্ধ যোগীই এ সংসারে সীসা সোণা হীরা কয়লা ও রত্নধূলা প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ মাত্রকেই একরূপ দর্শন করেন এবং তাঁহাদিগেরই সেই জ্ঞানাঞ্জনরঞ্জিত নেত্রেই এই সমুদায় পার্থিব পদার্থ পৃথ্বীবিকার ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উদ্ভাসিত হয় না।

বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের ফল এক নহে। বিজ্ঞানের ফল মুক্তি, আর সাধারণ জ্ঞানের ফল বন্ধন। অতএব যাহারা এই দুইয়ের একত্ব সমাধান পূর্ব্বক সাধারণজ্ঞানে অভিমানী হয়, তাহাদিগের ন্যায় মায়ামুগ্ধ অন্ধ জীব এজগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে?

যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আগামী প্রস্তাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এই স্থানে কাঙ্গাল হরিনাথের একটী সঙ্গীত তুলিয়া দিয়া যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা সহজ করিতে চাই। গানটী এই—

শোন্ রে, অবোধ কাঙ্গাল, আমি তোরে প্রবোধতত্ত্ব কই।
ওরে, আমি মেয়ে, আমি ছেলে যুবক যুবতী হই।

১। ওরে আমি, বৃদ্ধ বৃদ্ধা আদি, আমি অনাদি আদি,
আমি বাদী প্রতিবাদী, বিধি অবিধি ;
দেখ্‌রে, পদ্মপত্রের জলের মত,
মায়া খেলায় লিপ্ত নই।

২। হই আমি সকল কিছু নও তুমি, মায়ায় আমি তুমি,
তুমি আমি, জগৎময় আমি ;
হোল আমি বলা রোগ যে তোমার,
আমি বই আর তুমি কই।

৩। এ দীন, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ বলে, ওমা বিমলে !
ব্রহ্মাণ্ডময় তুমি যা হও আমি তোর ছেলে ;
ওমা, তুমি আমার হৃদ্‌কমলে,
আমি তোমার হোয়ে রই।

৪। কাঙ্গাল বলে মাগো, তুমি যে সকল, সে আসল নয় নকল,
যেমন ইচ্ছা, পিতামাতা যা হও তুমি, আমি তোর কেবল ;
তোমার চরণতরি ভবসম্বল,
না জানি ঐ চরণ বই !

[১৫]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—যোগ

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিজ্ঞান-যোগের কথা বলিয়াছি; বর্ত্তমান প্রস্তাবে অধ্যাত্মযোগ, বিভূতিযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলিব। কথাগুলি সমস্তই কাঙ্গালের, আমি লিপিকরমাত্র।

অধ্যাত্ম-যোগ।

অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক যে যোগ, তাহাকেই অধ্যাত্ম-যোগ বলে। এ স্থলে আত্মা শব্দ পরমাত্মার লক্ষিত নহে, জীবাত্মাই ইহার লক্ষ্য। এক্ষণে পুনরায় বলিতে হইতেছে যে, জীবাত্মা বিষয়ক যে যোগ অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ সমাধানত্ব, তাহারই নাম অধ্যাত্ম যোগ। অধ্যাত্ম যোগ অভ্যাসের অনন্যচিন্তা হইতেই আত্ম-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া এক মাত্র পরমাত্মাই যে কেবল জীবের অধিগম্য, ইহা উদ্বোধিত হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম যোগেরই একটি বিশেষ অঙ্গ আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান। আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে তন্ন তন্ন করিয়া—জীব বলিতে জীবের চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান পঞ্চবায়ু, অথবা উক্ত দশেন্দ্রিয়ের পরিচালক মনঃ পর্য্যন্তও জীব নহে, ইহা স্থিরীকৃত হওয়ার পর একমাত্র আত্মাই জীব শব্দের বাচ্য যখন নিশ্চয় হয়, তখনই মানব অধ্যাত্ম যোগতত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় এবং

ক্রমেই অধ্যাত্মতত্ত্বানুসন্ধানে পরমাত্মার বদ্ধদশা আলোচনা করিয়া অনু-শোচনা করে। সেই সময়েই মানবের ইহা লক্ষিত হয় যে, স্বচ্ছন্দবিপিন-বিহারী সুপক্ক মিষ্টফলাহারী বিহঙ্গম যেমন ব্যাধজালে বন্দী হইয়া বিলাসীর বিলাস-ভবনে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ হয় এবং বিলাসীর ইচ্ছানুরূপ ফল ভোজন করিয়া যারপরনাই কষ্ট অনুভব করে; সেইরূপ সদানন্দ—কাননের অমৃতফলভোগী জীবাত্মা-বিহঙ্গও কর্ম্ম-ব্যাধের জন্মজালে বন্দী হইয়া আজ মায়াবিলাসিনীর বিলাসভবন সংসারে দেহপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। সংসারে এত যে হাহাকার, এত যে আর্ত্তনাদ, এত যে ঘোর অশান্তির উচ্চ আবেদন, ইহা কেবল সেই মায়াবিলাসিনীর ইচ্ছানুরূপ স্ত্রী পুত্র ধনজনস্বরূপ আশু-মধুর, পরিণাম-হলাহল ফলভোজনে শোকতাপ-জরা-মৃত্যু বিষজ্বালায় বিহঙ্গের মর্ম্মভেদী চীৎকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাই, সেই সময়ে জীবাত্মা মায়াবন্ধন-মুক্তি-কামনায় পিঞ্জর হইতে পরিত্রাণকামী বিহঙ্গের ন্যায় অধীরচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রান্ত হয়। এই যে সংসার-সুখবিমুখ জীবাত্মার মায়াবন্ধন হইতে পরিত্রাণের একান্ত চেষ্টা, ইহাই অধ্যাত্মযোগের পরমতত্ত্ব। অর্থাৎ আমার বলিতে এ সংসারে আমার কিছুই নাই, যত কিছু আমার বলিয়া ব্যবহার করি, ইহার কাহারও সহিত আমার চির-সম্বন্ধ থাকিবে না এবং যাহাকে আমার পরম মঙ্গলনিদান বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাই আমার ঘোর অমঙ্গলের বিষম আলয়, ইত্যাদি রূপে সংসারের অসারত্ব নিশ্চয়ের পর একমাত্র পরমাত্মাই আমার গতি, আশ্রয়, ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধই আমার চির সম্বন্ধ এবং তাঁহার ক্রোড়েই আমার রোগ শোক জরা মৃত্যু প্রভৃতি সংসার-তাপহারী পরমমঙ্গলালয়, ইহা উদ্বোধিত হইলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসমাধানতত্ত্বে নিবিষ্টতাই অধ্যাত্ম-যোগের আনন্দাস্বাদ মধুর সিদ্ধফল। অধ্যাত্ম যোগতত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়াই

যোগী, কিরূপে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কিরূপে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে জীবকে মায়ার অধীন হইয়া আর সংসারে যাতায়াত করিতে না হয় ইত্যাদি রূপে অধ্যাত্মতত্ত্ব হৃদয় মাঝে প্রস্ফুরিত করিয়া তত্তৎ উপায় অবলম্বনে সংসার হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

বিভূতি-যোগ।

বাক্য মনের অগোচর এক অদ্বিতীয় অনন্ত পরব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশ ও বিস্তার করিবার ইচ্ছায় যে সকল উপাদানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন, সে সমুদায়ই তাঁহার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য। সেই বিভূতি-তত্ত্বে চিত্তসমাধানকেই বিভূতিযোগ বলে। এই নিখিল জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু প্রকাশিত, যাহা কিছু জীবনেত্রে উদ্ভাসিত, যাহা কিছু জীবনেত্রের বহির্ভূত হইলেও সূক্ষ্মকারণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত অর্থাৎ দেব দানব মানব, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব অপ্সরঃ কিন্নর প্রভৃতি অনন্ত জীব ও এতদ্ভিন্ন প্রস্তর কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদি অজীব শ্রেণীতে যাহা কিছু সত্তা লক্ষিত হয়, সে সমুদায়ই সেই এক অদ্বিতীয় অচিন্তনীয় স্বয়ংবেদ্য পরমেশ্বরের নিজ বিভূতি। তিনি এই অনন্ত বিভূতি-মণ্ডলের সূক্ষ্ম কারণরূপে অবস্থিত হইয়া জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড-লীলায় অভিনয় করিতেছেন। এই ভব-নাটকের মায়া-নাট্যশালায় সূত্রধরও যিনি, নটও তিনি। যিনি এ নাটকের রচক, তিনিই আবার অভি-নেতা ও দর্শক। সুতরাং এ নাটকের দোষ গুণ বিচারভারও তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত এবং আমোদ-প্রমোদানন্দভোগীও তিনি। এই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই ত সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ এক অদ্বিতীয় হইয়াও ভব-নাটকের অবতারণা পূর্ব্বক বহুত্বে দ্বিতীয় হইলেন, অনন্তব্রহ্মাণ্ডেশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিজ বিভূতি প্রকাশপূর্ব্বক নিত্যলীলায় নিত্য উন্মত্ত হইলেন।

অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডলবেষ্টিত গগনতলে তিনিই সুধাকর সাজে সদা সুধাবর্ষী; দেবগণমধ্যে অমরাবতীর অধীশ্বর নন্দনকাননবিহারী দেবেন্দ্র হইয়া তিনিই স্বর্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত; পুরোহিতমণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতি হইয়া তিনিই সর্ব্বহিতে সর্ব্বদা নিরত; তিনিই কবিকুলচূড়ামণি ভার্গব রূপে অবস্থিত; তিনিই নিয়ন্তৃগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ হইয়া জীবজগতের পাপপুণ্য-বিচারক রূপে নিত্য অধিষ্ঠিত। অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকার্য্যে যিনি তাহার অধিপতিরূপে বিরাজ করিতেছেন, সে সকলই তাঁহারই স্বরূপ অর্থাৎ সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিই স্বীয় বিভূতিযোগে সেই সেই কার্য্যের অধিপতি রূপে ব্রহ্মাণ্ডময় নিত্য বর্ত্তমান। আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত তাঁহার বিভূতি অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু। অতএব সৃষ্ট হইয়া স্রষ্টার গুণতত্ত্ব স্থির করা সৃষ্টিজগতের বহির্ভূত। তাই ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবরাশির কেহই তাঁহার গুণতত্ত্ব তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ নহেন। তিনি সকলকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে এ জগৎ-সংসারে আর কেহই নাই। তিনি এ জগৎ-সৃষ্টির আদ্য, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ ইহার প্রবাহ প্রবাহিত হইবার কারণও তিনি, ইহার প্রচলিত প্রবাহ সংরক্ষণের হেতুও তিনি এবং কালে সে প্রবাহ বিশুদ্ধ হইবার মূলও তিনি। তত্ত্বতঃ এ সমুদায়ের আদ্য, মধ্য ও অন্ত তাঁহাতেই অবস্থিত। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মাণ্ডপতির বিভূতি-তত্ত্ব অনুভব করিয়া বিভূতি-যোগ অবলম্বনে অর্থাৎ তিনি আদি, এক, অদ্বিতীয় মহাপুরুষ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিভূতি; এই বিভূতিমণ্ডলে নিত্য নিত্য ক্রীড়মান, এই রূপ সমাহিত চিন্তায় সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের নিত্যলীলা দর্শন দ্বারা আত্ম-কৃতার্থতা লাভই বিভূতি-যোগের পরম, চরম ফল। বিভূতি-যোগের এই যোগিজনদুর্ল্লভ নির্ব্বাণানন্দ ফল যোগী ব্যতীত অন্যের উপভোগ করা কল্পনার অতীত।

বিভূতিযোগে যে আনন্দের উপলব্ধি হয়, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে বা অন্যান্য যোগ-সাধনে তাহা হয় না।

ভক্তি-যোগ।

ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভক্তিযোগের তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করা, আর বর্ণপরিচয়হীন বালকের রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে পুরাণবেত্তা হইতে ইচ্ছা করা, একই কথা। ভক্তির স্বরূপলক্ষণ নিরূপণ করিতে পারে, জগতে এমন কোন ভাষার সৃষ্টি হয়ও নাই ও ভবিষ্যতে হইবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ ভক্তি গোলোক-কৈলাসের সম্পত্তি। ভক্তিলতিকার আশ্রয় ভগবত্তরু যেমন অনির্ব্বচনীয়, এই লতিকাও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়া; সুতরাং বাক্যে বা লিপিতে ইহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে চেষ্টা পাষাণে বীজাঙ্কুরোৎপাদন চেষ্টার ন্যায় বৃথা আয়াসমাত্র, সন্দেহ নাই। "ভক্তি" এই দুটী অক্ষর শ্রুতিগোচর হইবামাত্র যাঁহার হৃদয়ে ইহার আনন্দমধুররসোৎস উৎসারিত হইয়া পড়ে, কেবল সেই ভক্তই ভক্তির স্বরূপতত্ত্ব অবগত এবং সেই ভক্তিযোগে ভক্ত-বৎসল ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য-সহচর হইয়া মর্ত্ত্যদেহে অমৃতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। বালককে যেমন যৌবনসম্ভব দাম্পত্যপ্রণয়ের মধুরতা, বালিকাকে যেমন যুবতীর পতিসহবাসসুখ এবং গোদুগ্ধপুষ্ট মাতৃহীন বালককে যেমন মাতৃ-স্তনের অমৃতোপম দুগ্ধের আস্বাদন বাক্যে বা লিপির সাহায্যে বুঝাইবার কোন ভাষা নাই এবং তত্তৎ বিষয় সম্ভোগ-কারী ব্যতীত অন্যের বুঝিবারও সাধ্য নাই; তদ্রূপ অভক্তকে অর্থাৎ যিনি ভক্তির মধুরতা কখন অনুভব করেন নাই, তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইবার কোন ভাষাও জগতে প্রচলিত নাই এবং ভক্ত ব্যতীত ভক্তির অমৃতময় স্বাদ উপলব্ধি করিবারও অন্যের সাধ্য নাই। তবে, অনুপযুক্ত

ব্যক্তিকে 'মধু'র মিষ্টতাকে বুঝাইতে হইলে যেমন "চিনির মত, গুড়ের মত" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে হয়, সেইরূপ তোমাকে সংক্ষেপে ভক্তিতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

সংসারে যাঁহারা আসিয়াছেন, আবাস স্থাপন পূর্ব্বক মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রীপুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ লইয়া বাস করিতেছেন এবং সংসারের অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণায় মর্ম্মাহত হইয়া "এই সংসার ত্যাগ করি করি" করিয়া পুনরায় সেই সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা-সরিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভালবাসা পদার্থ যে কি এবং ভালবাসার বিশ্বমোহিনী শক্তির শক্তি যে কতদূর, ইহা আর বুঝাইবার অপেক্ষা নাই। একবার এই ভালবাসার ভুবনমোহিনী মহীয়সী শক্তির প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রসারণ কর, দেখিবে—অনন্ত জীব-জগৎ কেবল ভালবাসাপাশে আবদ্ধ হইয়াও নিয়ত পরিভ্রান্ত হইতেছে। পিতা মাতা যে সন্তানের লালনপালনে নিজ প্রাণকে উপেক্ষা করিয়া যারপরনাই কষ্ট স্বীকার করিতেছেন; সতী রমণী যে, পতির জন্য অসহনীয় যন্ত্রণাকেও হৃদয়-সহচরী করিয়া থাকেন; স্বামী যে, সংসারের মহাবিষকে হৃদয়ে পোষণ করিয়াও পত্নীর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েন; সন্তান যে, বহুকষ্টে পতিত হইলেও প্রাণ থাকিতে পিতামাতার সেবা শুশ্রূষায় বিরত হয়েন না এবং ভ্রাতা যে ভ্রাতার জন্য জীবন দান করিতেও ভীত বা কুণ্ঠিত হয়েন না, একমাত্র ভালবাসাই এই সমুদায়ের মূল কারণ। এই ভালবাসার আর একটী বিশেষ শক্তি এই যে, যাহার সহিত আমার কোন পুরুষে সম্বন্ধ অর্থাৎ জাতিগত, বর্ণগত, সমাজগত বা আশ্রমগত কোন সংস্রব নাই এবং কোন কালে সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনাও যে স্থলে কল্পনার বহির্ভূত, সেই স্থলে এই ভালবাসা এমনই সম্বন্ধপাত করে যে,

চিরজীবনেও তাহার বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই যে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিশ্বপ্রাণসম্মোহিনী ভালবাসা বা প্রেম, ইহার চরম পরিণতি শক্তিই ভক্তি। এই স্থানে কাঙ্গালের একটী গান তুলিয়া দিলে কথাটা নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তিরও বোধগম্য হইবে। গানটী এই—

ওরে ভাই জ্ঞানে যোগ, যোগে প্রেম, প্রেমের পরে ভক্তিতত্ত্ব।

১। আগে যার জ্ঞান হয় নাই, যোগ হয় নাই,
সে বোঝে নাই প্রেমের তত্ত্ব ;
প্রেমতত্ত্ব যে না বোঝে, সে যে, নিজে কামে মজে, সত্য সত্য।
(ভক্তিতত্ত্ব ভজন কোরে, নিজে হয় গৌরী সেজে,
নিজে রাধা কৃষ্ণ সেজে, বিষয় বিষম গরল রসে)

২। জ্ঞানযোগে যার প্রেম হোয়েছে, সেই বুঝেছে,
প্রেমে আছে কি মাহাত্ম্য ;
প্রেমিকের পবিত্র ক্ষেত্রে, দিব্য নেত্রে, যখন ভাসে পরমার্থ।
[তখনই ভক্তির প্রকাশ]

৩। পরমার্থ ভজনের ধন, নিখিল-জীবন, যাহার যেমন সাধন তত্ত্ব ;
তেমনি তার, ইচ্ছামত, স্বরূপত, হৃদে জাগে নিত্য নিত্য।
(যে যেমন ভালবাসে, ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে)

এই ভক্তিযোগই কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা পরমানন্দপদপ্রদায়ক শ্রেষ্ঠ যোগ এবং সকল যোগ অপেক্ষা নিরাপদ। ভক্তিপদার্থ স্বরূপতঃ কি, ইহা নিশ্চয় করা জীবজ্ঞানের অতীব সুকঠিন। তবে, ভক্তির প্রসাদলাভ যে, ভগবানের অনুকম্পা-সাপেক্ষ, ইহা ভক্ত সাধক মাত্রেরই সাধন-প্রত্যক্ষ। জীব যখন বিরক্ত ও সন্তপ্ত হইয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক ক্ষণভঙ্গুর সুখ হইতে ভগবান্‌কে নিত্য সুখকর, নিত্য

উৎসবানন্দদায়ক ও পাপে অবিদ্ধ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বলিয়া লক্ষ্য করে, তখনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া সংসারাসক্তি নিরসনপূর্ব্বক ভগবদনুরাগকে হৃদয়াসন প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে যতই সংসারসুখ অনিত্য ও ভগবৎসঙ্গ নব নব আনন্দের তরঙ্গসিন্ধু বলিয়া অনুভূত হয়, ভগবদনুরাগ ততই বর্দ্ধিত হইয়া সংসার হইতে জীবকে ভগবানের দিকে অগ্রসর করিতে থাকে। ভগবানের প্রতি বর্দ্ধিত অনুরাগের গাঢ়তাই ভক্তির লক্ষণ। ভক্তির জগদাকর্ষিণী শক্তিযোগে ভগবান্‌কে আপনার হৃদ্‌কমলে নিত্য অধিষ্ঠিত দেখিয়া শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন ও বন্দনাদি দ্বারা নিত্য-উৎসবানন্দ সম্ভোগ করাই ভক্তিযোগের কার্য্য।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তৃণগুচ্ছ দাহের শক্তিদর্শনে প্রলয়াগ্নির বিশ্বদাহনশক্তির সম্বন্ধে যেমন কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না ; তদ্রূপ ভালবাসার আকর্ষণে জীব-জগৎকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া তৎপরমপরিণতি ভক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের ভক্তহৃদয়ে উদয় হওয়া সম্বন্ধেও কাহার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ের প্রমাণ অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রজ্বলিত অনলরাশির গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ-দাহকত্বই যেমন প্রলয়াগ্নির বিশ্বদাহিকা শক্তির প্রমাণ ; সেইরূপ ভক্তির উদয়ে ভাগবতগুণ অর্থাৎ ভাব, পুলক, অশ্রুপাত, গদগদচিত্ততা প্রভৃতির প্রকাশই ভক্তহৃদয়ে ভক্তির আকর্ষণে ভগবানের আকৃষ্ট হইবার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ভক্তির অঙ্কুরেই ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই ভাবের পূর্ণোদয়েই ভক্ত, মান, সম্ভ্রম, যশঃ, জয় ও লাভ প্রভৃতি সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের পূজা, অর্চ্চনা, বন্দনা এবং লীলা শ্রবণকীর্ত্তনাদি বিষয়ে নিয়ত লিপ্ত থাকিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন।

যে ভাব অন্তঃকরণে উদিত হইলে স্বতএব হৃদয়সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া পড়ে ; ভগবন্নাম ও লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে জলধারায় আঁখি-

যুগল প্লাবিত করে; ঘনশ্বাসে ঘন ঘন হৃদয়বৃত্তির আনন্দ আবর্ত্তন আরম্ভ হয়; জগৎসংসার ভুলাইয়া ভগবল্লীলাতত্ত্বে কেবল "আমি তুমি" ভিন্ন অন্য অস্তিত্ব লোপ করে এবং ভগবল্লীলাদর্শনে বা শ্রবণে কখন হাসি, কখন ক্রন্দন ও কখন উন্মত্তবৎ নৃত্যে উন্মত্ত করে; সেই ভাবের নামই প্রেম; এ প্রেমের ভক্তিই শক্তি।

পাত্রভেদে যেমন ভালবাসার নানা নামভেদ আছে; অর্থাৎ পিতা মাতা গুরুজনের প্রতি সন্তানের ভালবাসা, তাহা ভক্তি; পতিপত্নীর পরস্পর যে ভালবাসা তাহা প্রেম এবং সমবয়স্কের সহিত সমবয়স্কের বা বন্ধুর সহিত যে ভালবাসা তাহা প্রণয়; তদ্রূপ ভক্তির ও সাধনার ভাব-ভেদে মধুর, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য প্রভৃতি নানা নামভেদ আছে। কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি পদার্থ যে এক, ইহা ভক্তমাত্রেরই সূক্ষ্মদৃষ্টির অন্তর্ভূত। অনেকে তুমি প্রভু, আমি দাস, এই প্রভুদাসরূপে দাস্যভাবের সাধনায় উদিত যে পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয় ভাব, তাহাকেই ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন; অন্য ভাবের সাধনায় উদিত ও অনির্ব্বচনীয় ভাবকে ভক্তি বলিতে চাহেন না। ইহা কখনই সঙ্গত নহে। সকল ভাবের সাধনায় উদিত ভাবই ভক্তিশব্দের বাচ্য। অর্থাৎ ভালবাসা শব্দের ন্যায় ভক্তিও সাধারণবাচিকা অর্থাৎ কোন এক বিশেষভাবে অবরুদ্ধা নহে। কারণ, মধুর, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য প্রভৃতি যে ভাবের যে কোন সাধক হউন না কেন, তাঁহার অন্তঃকরণে ঐ ভাবের উদয় হইলেই তাঁহাকে ভক্তির উদয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাৎসল্যভাবে যাঁহার হৃদয় সাধনায় অগ্রসর, তাঁহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্রবী-ভূতা হইয়া পুলক, ভাব-গদগদচিত্ততা এবং উন্মত্তবৎ নৃত্য, ক্রন্দন ও হাস্য প্রভৃতি ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিলে তাহাকে কি ভক্তির উদয় বলিয়া অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য আছে? কখনই নহে। সেইরূপ মধুর দাস্য প্রভৃতি ভাবে ঐ সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে ভক্তির

উদয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ভক্তিপদার্থ সাধারণ ভাবগ্রাহী হইয়াও যে, এক, অভিন্ন, ইহাতে আর কাহারও সংশয়ের কোন কারণ নাই। অতএব সাধনার ভাবভেদ জন্য মধুর, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য প্রভৃতি নামভেদে একমাত্র ভক্তির যে নানা রসভেদ, ভক্তিরাজ্যে এ সম্বন্ধেও কাহারও আর কোন কথা বলিবার নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব হৃদয়কন্দরে সঞ্চারিত হইলে বুঝিতে হইবে, যে, ভক্তিলতিকা অঙ্কুরিতা হইয়াছে। ভগবত্তরুর সত্ত্বা এ জগৎসংসারের কি অন্তর, কি বাহির কোথাও ছাড়া নাই। তাই, এই ভক্তিলতিকা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতা হইয়া সম্মুখস্থ ভগবত্তরুকে আশ্রয় করে বা তাঁহার সহিত সংযুক্তা হয়। ভক্তির এই যোগকেই ভক্তিযোগ বলে। এই ভক্তিলতিকার মূলে ভক্ত, শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদিরূপ যতই জলসেচন করিতে থাকেন, লতিকা ততই তেজস্বিনী ও লতিকা হইয়া ভগবত্তরুর সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করে। চিন্তাতীত সেই অপরিমেয় ভগবান্‌কে যে ভক্ত সমাজে পরিমিত, ভক্তবশীকৃত ও ভক্তবাঞ্ছাপূরণ কল্পতরুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়; ভক্ত যে, "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে ভগবান্‌কে অপরিসীম, বাক্যমনের অগোচর ও সর্ব্বব্যাপী বিরাট অনুভব করিয়াও "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং" এই মন্ত্রে আবার নিজ মনঃপ্রাণ ও হৃদয়ানুরূপ করিয়া এককুশীর জলে তাহার স্নানকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক সংসারাদিত্যসন্তপ্ত নিজ হৃদয়কে শীতল বোধ করিয়া থাকেন; "মায়াসূত্রপট্টাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরু-তেজসে" মায়ারূপ সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিতা হইয়া যে, তুমি গুহ্য (গোপনীয়) ও উরু (বিশাল) তেজকে আবরণ করিয়া অবলম্বন করিতেছ; "নিরাবরণং বিজ্ঞায় বাস স্তে কল্পয়ামহম্" সেই তোমাকে নিরাবরণ জানিয়াও আমি তোমার সম্বন্ধে বাসের কল্পনা করিতেছি, এই মন্ত্রে ভগবানের পরমতত্ত্ব অনুভব করিয়াও ভক্ত যে, নয়নজলে অভি-

ষিক্ত হইয়া ভগবানকে পরিধেয় পরিধান পূর্ব্বক আপনার পরিধেয় পরিত্যাগের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন; ইহাই সেই বর্দ্ধিতা ভক্তি লতিকায় প্রস্ফুটিত ভজনকুসুমের বিশ্ব-প্রাণোন্মাদন মধুর আনন্দ-সৌরভ; এবং অন্তকালে ভীষণ কালের বিষনৃত্য দেখিয়াও ভক্ত যে,ভগবল্লীলাগানে উন্মত্ত হইয়া আনন্দসন্দোহ মধুরধ্বনির সঙ্গে কালের নৃত্য দর্শন করিতে করিতে মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া অমৃতধামে গমন করেন, ইহাই সেই ভক্তি-লতিকার ত্রিজগদারাধ্য, সুরেন্দ্রবাঞ্ছিত, যোগীন্দ্র-অলভ্য মধুর অমৃতফল, যাহার নিকট নির্ব্বাণও নির্ব্বাণতুল্য। তাই বলি, এই ভক্তিলতিকার সহিত ভগব-ত্তরুর যে যোগ, সেই ভক্তিযোগতত্ত্ব বুঝাইবার কথাও নাই, লিখিবার ভাষাও নাই, ও প্রত্যক্ষ করাইবার পদার্থও নাই, এবং সেই তত্ত্ব বুঝিবার, শুনিবার ও দেখিবার লোকও জগৎসংসারে অতি বিরল।

[১৬]

ব্রহ্মাণ্ডবেদে—ষট্‌চক্র সাধন।

কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদে' যত তত্ত্ব আছে, তাহার কোনটীরই সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না; অনেক কথা পড়িয়া রহিল, এদিকে গ্রন্থের কলেবরও বড় হইয়া যাইতেছে। তাই আমি অতি সংক্ষেপে ষট্‌চক্র সাধন সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রহ্মাণ্ডবেদে কি বলিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিয়া 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের পরিচয় শেষ করিব। ষট্‌চক্রসাধক কোন্ চক্রসাধনে কি প্রকার ফল লাভ করিয়া থাকেন, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনুষ্যের মূলাধারে অর্থাৎ পৃথ্বীশক্তি-ময় প্রথমচক্রে কুণ্ডলিনীশক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইনি ব্রহ্মলীলা-প্রকাশিনী, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমদায়িনী, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মনুষ্য ব্যতীত পশ্বাদি ইতর জন্তুর দেহে উক্ত সম্বিদাহ্লাদিনী শক্তি নাই। তন্নিমিত্ত তাহারা আজীবন জ্ঞান ও প্রেমে বঞ্চিত হইয়া দেহ সংবরণ করে; কিন্তু তাহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা যে কে, তাহা জানিয়া তাঁহাকে প্রেম করিতে পারে না এবং উক্ত দেহসত্তে কখন জানিতে ও প্রেম করিতে পারিবেও না। কুণ্ডলিনীশক্তি মনুষ্যদেহেও অব্যক্তরূপে রহিয়া-ছেন। ইনি যে পর্য্যন্ত ব্যক্তা বা প্রসন্না না হয়েন, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য যে কার্য্য করে, তাহা বুদ্ধি বা প্রতিবিম্বিত সংসার-জ্ঞানেই করিয়া থাকে এবং জ্ঞানের কথা যাহা বলে, তাহাও তাহার স্বতঃ জ্ঞান নহে, শিক্ষিত বা মার্জ্জিত প্রতিবিম্বিত জ্ঞানমাত্র। কুণ্ডলিনীশক্তি

জাগ্রত বা প্রসন্ন হইলে জীবের আত্মজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইয়া থাকে। যে সাধকের যতদূর এই জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহার নেত্রাদি হইতে বিদ্যুতালোকবৎ তাদৃশ আলোক প্রকাশিত হইয়া ক্রীড়া করে। এই আলোক সাধক ব্যতীত অন্যের দর্শনীয় নহে। মনুষ্যের মূলাধার-চক্রপৃথ্বী গুণময়; সুতরাং কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে পৃথিবীর প্রধান গুণৈশ্বর্য্য নানাপ্রকার সৌগন্ধ সাধকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। সাধক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি এই আঘ্রাণ প্রাপ্ত হয় না। বিদ্যুদ্বৎ আলোক দর্শন ও নানাবিধ সুগন্ধ আঘ্রাণ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইবার অব্যর্থ প্রমাণস্বরূপ। কুণ্ডলিনী ব্রহ্মের জ্ঞান ও প্রেমময়ী তাড়িচ্ছক্তির আধার, তন্নিমিত্ত সৌদামিনীস্বরূপিণী হইয়াছেন। মানবদেহ অসম্পূর্ণ হইলেও দেহী অর্থাৎ জীব উক্ত শক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান দেহেই দেবত্ব ও দেবত্বের পর শিবত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মের নিত্যলীলার সহচরত্ব বা সহচরীত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা কুণ্ডলিনীশক্তিকে নিদ্রিতা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবদেহে মূলশক্তি অস্ফুট বা নিশ্চেষ্টাবস্থায় থাকে। কায়াগ্নি ও স্নায়বিক অপরশক্তির উত্তেজনার দ্বারা উক্ত পরাশক্তিকে উদ্বোধিত অর্থাৎ বোধন করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহার ঊর্দ্ধগতি সম্পাদন করিতে হয়। বাস্তবিক, ইহারই নাম ষট্চক্রভেদ।

প্রথমচক্র মূলাধারে কুণ্ডলিনীর বোধন করিয়া দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠানে উক্ত শক্তিকে উন্নীত করিবে। স্বাধিষ্ঠান জলস্থান অর্থাৎ জলেতে ব্রহ্মের যে স্বরূপশক্তি আছে, স্বাধিষ্ঠানচক্রে কুণ্ডলিনীশক্তি উন্নীতা হইলে জীব সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান লাভ করিলে পূর্ব্ব প্রকাশিত বিদ্যুতালোক, তাহা অপেক্ষা কিছু গাঢ়তর বোধ হয় এবং জলকণ-সমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া যেমন নানাবর্ণের উদ্ভাবন করে, এই চক্রে সাধক তদ্রূপ নানাবর্ণ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। তদূর্দ্ধে

মণিপুরচক্রই অগ্নিস্থান। কুণ্ডলিনীশক্তি সেই স্থানে প্রবেশ করিলে অগ্নিতে ব্রহ্মের যে স্বরূপশক্তি আছে, জীব সেই জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং গাঢ়তর বিদ্যুদালোকে আরও গাঢ়তা ও কিছু কিছু উষ্ণতার অনুভব হইয়া থাকে। কুণ্ডলিনী অগ্নিস্থান ভেদ বা অতিক্রম করিয়া বায়ুচক্র হৃদয়স্থানে উন্নীতা হইলে জীব, বায়ুতে ব্রহ্মের যে স্বরূপশক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয়। যে হেতু সত্ত্বগুণ হইতে বায়ুর প্রকাশ; উক্ত সত্ত্বগুণ যতই বিশুদ্ধ হইতে থাকে, জীবও ব্রহ্মবিভূতি ও ব্রহ্মলীলা ততই পরিস্ফুটরূপে প্রত্যক্ষ করেন। ঐ সকল বিভূতি ও লীলা বৈকুণ্ঠলীলার আভাসমাত্র; সুতরাং সাধক নিজের ভাব-সাধনানুসারে ঐশ্বর্য্যময়ী রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্বে প্রতি চক্রে স্বরূপশক্তি ও তাহার বিভূতি প্রত্যক্ষ হয়, কোনপ্রকার লীলা প্রত্যক্ষ হয় না। জীবের অন্যান্য গুণ সত্ত্বগুণে তন্ময় ও সত্ত্বগুণ নির্গুণ ভাবাপন্ন হইলে হ্লাদিনীশক্তি প্রকাশ হইয়া সাধকের দ্বাদশদল হৃদয়পদ্মের কেন্দ্র-চক্রে যে ব্রজলীলার আভাস উদ্ভাসিত করে, তাহা ঐশ্বর্য্যময়ী বৈকুণ্ঠ-লীলা নহে, মাধুর্য্যময়ী গোলোকলীলার ভাবোচ্ছ্বাসের ছায়ামাধুরী মাত্র। ব্রহ্মস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি, সন্ধিনী ও সম্বিদাহ্লাদিনী ত্রিশক্তিময়ী। হৃদয়চক্রের নিম্নতর কোন চক্রে কুণ্ডলিনীর হ্লাদিনী অর্থাৎ প্রেমশক্তির প্রকাশ হয় না। কেবল তদীয় সন্ধিনী সম্বিচ্ছক্তির প্রভাবেই সাধক-গণ তত্রত্য চক্রগুলির স্বরূপশক্তি ও বিভূতি দেখিয়া থাকেন। কুণ্ডলিনী হৃদয়চক্রে অবস্থান করিলেই যে, সকল সাধকেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা নহে। যাঁহাদিগের উক্ত শক্তি প্রসন্না হন, কেবল তাঁহারাই পরিণামে ব্রজলীলাগাথা বলিতে ও লিখিতে পারেন। অন্যথা কেবল সম্বিচ্ছক্তির প্রসন্নতায় ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময়ী

বৈকুণ্ঠলীলা পরিণামে বক্তৃতা করিতে ও লিখিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

হৃদয়চক্রের ঊর্দ্ধদেশে কণ্ঠচক্র। এই কণ্ঠচক্রকে আকাশচক্রও বলা যাইতে পারে। কেন না কণ্ঠই শব্দোৎপত্তির স্থান। এই স্থানেই বিষ্ণু-শক্তি বাগ্‌দেবী বিরাজ করিতেছেন। কুণ্ডলিনী এই স্থানে উন্নীতা এবং তদীয় সম্বিচ্ছক্তির সহিত কণ্ঠস্থ বাগ্‌বাদিনী শক্তির মিলন হইলে সাধক বাক্‌সিদ্ধি লাভে কবি হইয়া থাকেন। পরন্তু হৃদয়চক্রে ব্রহ্মের যে লীলা দর্শন করিয়াছেন, তখন তাহা গীতি ও গদ্যে পদ্যে প্রকাশ এবং সাধু ভক্তগণের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনিও পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। আদিকবি বাল্মীকি ও মাধুর্য্য লীলাকবি ব্যাসদেব প্রভৃতি কবিগণ এই প্রকারেই ব্রহ্মলীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সাধকের হৃদয়চক্রে সত্ত্বগুণের যে বিমলত্ব, তাহাই শুদ্ধচৈতন্য অর্থাৎ নারদ নামে পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রামায়ণ রচনার পূর্ব্বে বাল্মীকি ও শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনার পূর্ব্বে ব্যাসদেবের সহিত দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ-কার একবার আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে আমার এই তত্ত্ব-কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। উক্ত জ্ঞান ও প্রেম কবিদ্বয়ের অনুসরণ করিয়াও পূর্ব্বসুকৃতিলভ্য কবিতাশক্তির প্রভাবেও অনেক ক্রমানুকবি রামলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ ও মাথুরলীলাময় বিবিধ গ্রন্থ ও গীতি প্রণয়ন করিয়া যশঃকীর্ত্তিলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন; কিন্তু ইঁহারা চক্র-সাধন করিয়া নিজে কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নাই। সে যাহা হউক, এই প্রকারে সাধককে অলৌকিক বাক্‌শক্তিসমর্থ করিয়া কুণ্ডলিনী যখন ধ্যাননিকেতন ভ্রূযুগলচক্রে উন্নীতা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রজজ্ঞান লাভের কারণকোষে প্রবিষ্টা হন, সাধক তখনই অসীম জগৎ এবং জগৎপতির জগন্ময় অভূতৈশ্বর্য্য ও জ্ঞান ধারণা করিতে

সমর্থ হইতে পারেন। এই চক্রে সর্ব্বপ্রকার আবরণমুক্ত হইয়া সাধক ত্রিনেত্রে ব্রহ্মদর্শনের শক্তি লাভ করে। অর্থাৎ সাধক প্রথম মূলাধার-চক্র হইতে কণ্ঠচক্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মের যে সকল স্বরূপশক্তি ও হৃদয়চক্রে যে লীলাভাস অনুভব ও দর্শন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিসকল স্পষ্টই দেখিতে সমর্থ হন। অধিকন্তু ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপের যুগল অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি সম্বিতের সহিত জ্ঞানস্বরূপ উমাকিশোর যুগলমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া অথবা দেখার মত দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম জ্ঞানশক্তিস্বরূপেই দেবাদি, মনুষ্যও জীবকে জ্ঞানদান করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত তিনি জগদ্‌গুরু নামে উক্ত হইয়াছেন। অতএব, উমাকিশোর যুগলমূর্ত্তিই জীবের গুরুপ্রত্যক্ষ। এই প্রকারে যে সাধকের গুরুপরাৎপর ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে অন্য গুরু কি বেদ বেদান্তাদির উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ সূর্য্যোদয় হইলে যে ব্যক্তি দীপালোকে আপনার শরীর দেখিতে যত্ন করে, সে ব্যক্তি অবোধ অথবা উন্মাদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবের মূলাধারচক্র পৃথিবী হইতে কণ্ঠচক্র আকাশ পর্য্যন্ত পঞ্চতত্ত্বই সগুণ, তাহার উর্দ্ধ ভ্রূযুগল-চক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত নিগুর্ণ। অর্থাৎ কণ্ঠচক্র পর্য্যন্ত যে স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা সত্ত্ব ও বিশুদ্ধত্ব গুণেই, আর ভ্রূ-যুগলচক্র হইতে যে ব্রহ্মমূর্ত্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা সগুণের ন্যায় প্রকাশিত হইলেও নিগুর্ণ অর্থাৎ সন্ধিনীশক্তি প্রদর্শিতা আনন্দঘন জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি। সুতরাং পঞ্চতত্ত্ব কা কথা, তাহার করণ যে ত্রিগুণ, উক্ত মূর্ত্তি তদতীত।

এই প্রকারে গুরুসাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারপদ্মে, মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে সাধক, জীব, (নিজের) ও পরমাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন এবং তখন তিনি

দেখিতে পান, এক শক্তিস্রোতঃ অধোদিকে জীবাত্মার প্রতি নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। অর্থাৎ পরমাত্মার ইচ্ছা ও আজ্ঞা, সূর্য্যকিরণ-জাল যেমন চন্দ্রে পতিত হইয়া তাহাকে আলোকিত করে, তদ্রূপ জীবকে জ্ঞানবিজ্ঞানালোকে দীপ্তিমান করিতেছে। পণ্ডিতেরা এই জ্ঞানকে হিতাহিত বিচারশক্তির আধার বিবেক বলিয়া থাকেন। সূর্য্য-কিরণে অংশানুক্রমে আলোকিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল যেমন দীপ্তি পায় এবং ষোড়শাংশ বা ষোলকলা পূর্ণ হইলে পূর্ণচন্দ্র নাম গ্রহণ করে; জীবও তদ্রূপ হিতাহিত জ্ঞানবিজ্ঞানে বিবেকযুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে মনুষ্যের বিবেকশক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ কাহারও পূর্ণ ও কোন কোন ব্যক্তির চন্দ্রকলানুরূপ ন্যূনাধিক। সূক্ষ্ম বিচার করিলে এই প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বিবেকও আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান বা বিবেক নহে, প্রতিবিম্বিত জ্ঞানবিবেক। কেন না, পৃথিবী অন্তরায় হইলে সূর্য্যালোকের অভাবে চন্দ্রমণ্ডল যেমন প্রকাশ পায় না অর্থাৎ রাহু-গ্রস্ত বা গ্রহণযুক্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ মায়া অন্তরায় হইলে জীবের জ্ঞানবিবেক থাকে না। এই নিমিত্ত প্রতিবিম্বিত জ্ঞানী বিবেকীদিগকেও অনেক সময় জ্ঞানবিবেকশূন্য গর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায়। জ্ঞান-প্রেমময়ী কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রৎ হইলে জীবের যে জ্ঞানবিবেক বিকসিত হয়, তাহাই তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানবিবেক। অর্থাৎ পরমা-ত্মার যেমন অনিবার ও অপ্রতিহত পরিপূর্ণ জ্ঞান, জীবাত্মা তাঁহার যেমন বিন্দু; তদ্রূপ অনিবার ও অপ্রতিহত জ্ঞানবিবেকযুক্ত। মায়াজাল ইহার অন্তরায় হইতে পারে না। ব্রহ্মশক্তি মায়া মহতী এবং জ্ঞানবিবেক ক্ষুদ্র হইলেও সূর্য্যকিরণাণু যেমন বৃহৎ কাচপাত্র ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে; তদ্রূপ মায়াচক্র ভেদ করিয়া পরমাত্মাকে বিদ্ধ করে। তখন সিন্ধু বিন্দু এক হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছা আর

জীবের ইচ্ছা মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। এই প্রকারে জীবের ইচ্ছা যে, ব্রহ্মেচ্ছায় সংযুক্তা হয়, তাহারই নাম জীবের অন্তর্ম্মুখ এবং ঐ রূপ সংযুক্ত হইয়া জীব সংসারের যে কার্য্য করে, তাহারই নাম বহির্ম্মুখ; এই প্রকারে জীবের ইচ্ছা, একবার অন্তর্ম্মুখী হইয়া পুনরায় বহির্ম্মুখী হইলে পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই জ্ঞানবিজ্ঞান এক প্রকার কার্য্য করিতে থাকে, কাহারও কার্য্যে কিছুমাত্র তারতম্য বোধ হয় না। সুতরাং উক্ত প্রকারে সিদ্ধ জীবের কার্য্যে আর কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ থাকে না এবং জন্ম জরা মরণ ও পতনভয় নিবারিত হইয়া মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে। সহস্রারপদ্মে কুণ্ডলিনী প্রবেশ করিলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে মিলন হয়, এই প্রকার মিলনই প্রকৃত যোগশব্দের বাচ্য। আসন নিয়ম ও প্রাণায়ামাদি যাহা যোগ শব্দে উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগাঙ্গ বা যোগপ্রণালী! সহস্রারপদ্মে জীব ও পরমাত্মার সঙ্গতিলাভ অর্থাৎ যোগ হইলে যোগানন্দরূপ অমৃতরস পান করিলে জীব মৃত্যুঞ্জয় এবং অনিমাদি অষ্টবিভূতিসিদ্ধ ও ত্রিজগন্মোহন কবি হয়। কুণ্ডলিনী অমৃতপানোন্মত্ত জীবাত্মার সহিত পুনর্ব্বার অধোমুখে ক্রমান্বয়ে সমুদায় চক্র বা পদ্ম পরিভ্রমণ ও তত্রত্য স্বরূপশক্তিকে অমৃতরস বিতরণ করতঃ মূলাধারে স্থিতি করেন। এই সময়ে সাধকের শরীর ভগবদ্ভাবে, মহিমায় ও প্রেমরসে উচ্ছলিত এবং আজ্ঞাচক্র বিশুদ্ধজ্ঞানবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব ভাবের আধার হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি আশ্রয় করিয়া সাধক, কুলপথে অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্য দিয়া এই প্রকারে কুণ্ডলিনীশরণে সহস্রারপদ্মে পুনঃ পুনঃ গতায়াত অর্থাৎ বারংবার তথায় উন্নীত হইয়া ও তত্রত্য পিযূষরস পান করিয়া মূলাধারপদ্মে আসিয়া থাকেন এবং সর্ব্বসিদ্ধি মোক্ষ লাভ করেন।

ইত্যগ্রে যে মোক্ষ-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা নির্ব্বিশেষ ও

সবিশেষ ভেদে প্রথমতঃ দুইপ্রকার, যথা—নির্ব্বিশেষমুক্তি ও সবিশেষ মুক্তি। নির্ব্বিশেষের নামই নির্ব্বাণ। যদি নির্ব্বিশেষসমাধি বুঝিয়া থাক, তবে তৎসঙ্গে নির্ব্বাণমুক্তিও বুঝিতে পারিয়াছ, সন্দেহ নাই। সবিশেষমুক্তি সামীপ্য সারূপ্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত। বস্তুতঃ সারূপ্যাদি লাভে জীবের যে ভববন্ধনমোচন, তাহাকেই সবিশেষমোক্ষ বলে। যদি সবিশেষ সমাধি বুঝিয়া থাক, তবে সবিশেষমোক্ষ বা মুক্তি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিয়াছ। তথাচ তৎসম্বন্ধে দুই একটী তত্ত্বকথা এইস্থলে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। কুণ্ডলিনীশক্তি যে সকল সাধকের হৃদয়ে কেবলমাত্র জ্ঞানময়ী সম্বিচ্ছক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রেমময়ী তদীয় হ্লাদিনী শক্তির কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই, এই জ্ঞানসাধকগণ সহস্রার চক্রে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানানুভবযোগ অমৃতরস পান ও পরিণামে নির্ব্বাণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি ভক্তিপ্রভাবে যে সাধকের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ করিয়াছেন, সেই সাধক হৃদয়চক্রে ব্রহ্মের যে লীলাভাস দর্শন করেন, সহস্রারপদ্মেও তৎসমুদায়ই ত্রিনেত্র-প্রত্যক্ষ এবং তাহা হইতে নিঃসৃত আনন্দরস পান করিয়া অমৃত হইয়া থাকেন ও পরিণামে নির্ব্বাণ পরমানন্দ লাভ করেন। ব্রহ্মের যে জ্ঞানস্বরূপ মূর্ত্তি ভ্রূচক্র দ্বিদলপদ্মে প্রকাশিত হইয়া সাধক ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই আবার সহস্রার সহস্রদলে আপনার প্রেমময়ী লীলামূর্ত্তি সকল বিকসিত করিয়া থাকেন। এক ব্রহ্মই জ্ঞানে জ্ঞানময়ী উমাকিশোর মূর্ত্তি এবং প্রেমে প্রেমময়ী সীতারামাদি রাধাকিশোর যুগলমূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান। তেজে তেজঃ মিশিবার মত অমূর্ত্ত ব্রহ্মে জীবের প্রবেশ যেমন নির্ব্বাণ-মুক্তির পরিণামফল, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ সমাধিতে বর্ত্তমান মানবদেহে কেবলানন্দের জ্ঞানানুভব মাত্র। আবার বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি দর্শন ও তাহার সহচর সহচরী হইয়া লীলানন্দ সম্ভোগ যেমন সবিশেষ মুক্তির পরিণামফল;

তদ্রূপ সবিশেষ সমাধির বর্ত্তমান মানবদেহে পরমানন্দ সম্পদ। বৈকুণ্ঠ-ধামেই পরাৎপর ঊর্দ্ধতমাংশে কৈলাস ও গোলোক। যে স্থলে অন্য কোন ভাবময় মূর্ত্তির আবির্ভাব নাই, সহচর সহচরীর সহিত জ্ঞান-মাধুর্য্যময়ী উমাকিশোরমূর্ত্তির নিরন্তর প্রকাশ, সেই ধামের নাম কৈলাস এবং যে ধামে কেবল সখাসখীগণের সহিত প্রেমমাধূর্য্যময়ী রাধাকিশোর-মূর্ত্তির নিরন্তর প্রকাশ, তাহার নাম গোলোক। জ্ঞানমাধুর্য্য মহাভাবে বাৎসল্যরস প্রধান এবং প্রেমমাধুর্য্য মহাভাবে মধুররস প্রধান। তৎস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পরাৎপর ভক্তজনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা-কল্পলতা ইচ্ছানুসারে সৎস্বরূপে জ্ঞানানন্দ বা প্রেমস্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আবার তৎস্বরূপ অর্থাৎ যে নির্ব্বিশেষ, সেই নির্ব্বিশেষ হইয়া থাকেন। এখন একবার ধ্যান করিয়া দেখ, নির্ব্বিশেষে সবিশেষ-তত্ত্ব হস্তাকমলকবৎ প্রত্যক্ষ হইবে।

আমি পূর্ব্বে যে নির্ব্বাণানন্দ ও নির্ব্বাণ-পরমানন্দের উল্লেখ করিয়াছি, সেই তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, নির্ব্বিশেষ সমাধির ফল ততই উজ্জ্বল-রূপে হৃদয়ফলকে প্রতিভাত হইতে থাকে। অমূর্ত্ত্য ব্রহ্ম নির্ব্বাণানন্দ এবং সমূর্ত্ত্য ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ চনকাদির দ্বিদলের ন্যায় অখণ্ড অব্যয় নিরঞ্জন-রূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বৈকুণ্ঠমূর্ত্তিসকল তাঁহার নিত্যলীলাময় ছায়া, সুতরাং অনিত্যলীলাময়ী। সম্বিৎ-হ্লাদিনীময়ী শিবশ্যাম ব্রহ্মমূর্ত্তি, প্রকৃতি পুরুষ কি দ্বন্দ্ব নহে। ভক্তের সাধনা ও প্রার্থনানুসারে কখন শিব, কখন রাধা, আবার কখন শ্যাম, কখন শ্যামা, এই মহাভাগবততত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নিত্যানিত্য ব্রহ্মাণ্ডে সকলই ব্রহ্মময়, সকলই ব্রহ্মলীলা ও ব্রহ্মমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ব্বাণ জ্ঞানানন্দরসে ভাবপ্রভাবে নির্ব্বাণ-প্রেমানন্দতরঙ্গে ব্রহ্মানন্দ জীবানন্দ যুক্ত করিয়া হংস হংসীস্বরূপ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন।

যদি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ সমাধিতত্ত্ব বুঝিয়া থাক, তবে এখন ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবে যে, কি উপায়ে উক্ত সমাধি লাভ করিতে পারা যায়। মানব মানবী যে যে উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত সমাধিযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়, যোগতত্ত্বে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছি, পরিশেষে ষট্‌চক্রসাধনও অতি সংক্ষেপে বলিলাম। এই ষট্‌চক্র সাধনের ষষ্ঠ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সপ্তমচক্র সহস্রারপদ্মে প্রবেশ করিলেই উক্ত প্রকার সমাধিযোগ হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। আবার সপ্তচক্র সহস্রারের উর্দ্ধেই কৈলাস গোলোকে জ্ঞান ও প্রেমময়ী পূর্ণব্রহ্মমূর্ত্তি। পরাৎপর ভক্ত ব্যতীত এই মূর্ত্তিতে সাধারণ ভক্তের সমাধিযোগ হয় না। কৈলাস গোলোক সপ্তচক্রের বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রেমমাধুর্য্যময় উর্দ্ধতম বিশেষ ধাম হইলেও অষ্টম বা চরম চক্রও বলা যাইতে পারে। ইহার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই বিরল জন্য এই চক্র অব্যক্ত অর্থাৎ অতিশয় গোপনীয়। প্রেমভক্তিময় রসকবি ব্যাসদেব নানা পুরাণে লীলাপ্রসঙ্গে ইহার আভাসমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। ষট্‌চক্র সম্বন্ধে কেবল এই কথাটী বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিতেছি যে, মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত কোন্ চক্র, কি কোন্ পদ্ম উর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ, কত দল ও কি বর্ণযুক্ত এবং তত্রত্য স্বরূপশক্তির কি আকার, কি বর্ণ ও কি প্রকার সিদ্ধিসাধন করিবার শক্তি, সিদ্ধঋষিগণ তাহা ধ্যান-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও ষট্‌চক্র সাধকগণের হিতার্থ ভাষাবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সমুদায় তত্ত্ব যাঁহারা কেবল শ্রবণ কীর্ত্তন ও নিদিধ্যাসনে সমাধিযোগের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইলেও প্রাণায়ামশীল ষট্‌চক্র-সাধকদিগের অর্থাৎ যে সকল যোগী ষট্‌চক্রভেদ করিয়া সমাধিযোগ লাভ করিতে তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পরমোপকারী।

শেষ কথা।

এইবার আমি বিদায় গ্রহণ করিব। কাঙ্গালের কথা ফুরাইবার নহে; আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল যদি এই এক কথাতেই অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলেও ফুরায় না। কাঙ্গালের বাউল সঙ্গীতের কথা যাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা আমি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি; আমি কাঙ্গালের পবিত্র জীবনকথা কিছুই বলিতে পারি নাই, সে কথা সম্যক্‌রূপে নিবেদন করা আমার ন্যায় মূর্খের পক্ষে অসম্ভব। তবুও যে দুই চারিটী কথা বলিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া যদি কেহ কাঙ্গালের প্রদর্শিত পথে আত্ম ও সাধনতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে প্রয়াসী হন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

সর্ব্বশেষে আমি কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম গানটী পাঠকগণকে উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
সত্যপথের সেই ভাবনা।

১। যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে,
ছোঁবে না রে সোনা দানা;
সেই পথে মনোসাধে চলরে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা।

২। সংসারের বাঁকা পথে দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা ;
দেখ্ আবার, ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে,
লয় রে কেড়ে সব সাধনা।

৩। কথন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে,
জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা ;
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী,
সহে যেন যমযাতনা।

৪। ফিকিরচাঁদ ফিকির কয় তাই, কি কর ভাই,
মিছামিছি পরভাবনা ;
চল যাই সত্যপথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না।

পরিশিষ্ট।

আত্ম ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গাল হরিনাথের রচিত অসংখ্য গান আছে; আমরা নিম্নে তাহার মধ্য হইতে অতি অল্প কয়েকটী দিলাম।

(১)

দেখ্‌ রে, অচৈতন্যের নাই কোন হুঁস্‌,
চেতন মানুষ তারে চালায়।
এইত জল আগুন আছে, জগৎমাঝে,
তারা কোথা বল্‌ কি গড়ায় ?
জল আগুন যোগ করিয়ে, কল গড়িয়ে,
চেতন মানুষ চড়ে বেড়ায়॥
(সে যে জল ঘুরায় ফিরায়)
মানুষে কল চালাচ্ছে, না বুঝিছে,
না চিনিছে সে আপনায় ;
বল্‌ছে, স্বভাবের কার্য্য, কি আশ্চর্য্য !
আপ্‌নি ভোলা আপন মায়ায়॥
(কৃতকর্ম্মের আঁধারে পড়ে)

এইত স্বভাবের কার্য্য, অনিবার্য্য,
চলে যদি কেহ চালায় ;
যে ইচ্ছায় চলে ফেরে, স্থগিত হয় রে,
সে চৈতন্য ঢাকা মায়ায়।
(অচৈতন্য কলের ঘরে)
যদি রে, স্বভাবগত, গতায়াত
স্থগিত কর্ম্ম হয় সমুদায় ;
তবে রে কল্ চালাতে, কল্ থামাতে,
মানুষ কেন কলের মায়ায়।
(চেতন) (যদি কল্ আপ্নি চলে)
(যদি কল আপনি ফেরে)
ফিকির কয়, কলে যেমন, মানুষ চেতন,
তেমনি চেতন মান্ষের মাথায় ;
বিরাজে, জগৎকর্ত্তা, পরমাত্মা,
যে মানুষে মানুষ গড়ায়।
(সে ত কলের গোড়ায়) (স্বভাব অভাব সবের গোড়ায়)
কাঙ্গাল কয় সেই ত মানুষ, পরম হুঁস্,
মানুষ বেহুঁস্ তাঁহার মায়ায় ;
আপ্নি হ'য়ে মানুষ, হয় অমানুষ,
চৈতন্যে অচেতন বানায়।
(আপনি চৈতন্য হারায়)
(আপনি চেতন হ'য়ে চেতন হারায়)

(২)

জীব রে, সদা সাধন কর সত্য, ব্রহ্ম-সনাতন সত্য,
সত্য বিনে সব অনিত্য,
জেন রে এই সত্য সত্য।
ভেবে দেখ বেদ্‌গাথা, অনুমানে তৎকথা,
বর্ত্তমানে সৎ যথা,
সৎই সত্য, সর্ব্বতত্ত্ব।
ওরে সৃষ্টি-স্থিতি নাইরে যখন, কে জানে তখন ব্রহ্ম কেমন,
সৃষ্টি-স্থিতি করি স্মরণ,
অনুমানই জ্ঞান-কারণ ;
এই অনুমান বর্ত্তমান হোলে, মূর্ত্তিমান হৃৎকমলে,
ইহাকেই প্রত্যক্ষ বলে,
প্রত্যক্ষে হয় স্থিরচিত্ত ॥ (ব্রহ্ম)
জীব রে, সদা সত্য কর সাধন, জ্ঞানের সঙ্গে হবে মিলন,
এই মিলনই যোগ-সাধন,
ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কারণ ;
ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞানচরম, জীব ব্রহ্ম করে সম,
প্রেম-ভক্তি নিরূপম,
বিনাশে মোহ মমত্ব ॥ (জীবের)
এ দীন কাঙ্গাল ফিকির বলে স্বরূপ, ব্রহ্ম, জীবের মধুস্বরূপ,
জীব ও ব্রহ্মে মধুস্বরূপ,
তৃপ্তিহেতু বিবিধ রূপ ;
সত্যেই ব্রহ্ম প্রকাশমান্, মধুরূপে শক্তি পুমান্,
জ্যোতিষ্মান্‌রূপ সুবিদ্যমান্,
সত্যামৃত শুদ্ধ বুদ্ধ ॥ (ব্রহ্ম)

(৩)

(তৎ) তুমি কি খেলা খেলিছ বসে আয়নার মাঝারে।
তোমায়, দেখব ব'লে, চোখ বুঁজিলে, ঘুরে বেড়াই
আঁধারে। (আমি)

১। নাহি কিছু ভাবি হে যখন, কল্পনাজল্পনা ছেড়ে
চেষ্টাহীন মন ;
তখন, কোথা হোতে, আচম্বিতে, দাঁড়াও চোখের উপরে।
(তুমি এসে)

২। আয়নার কি গুণ নারি বুঝিতে, তার দুই ধারে
তুমি আমি পাই দেখিতে ;
এই জগৎ আছে, তোমার মাঝে, তুমি জগৎ অন্তরে।
(অন্তর বাহির)

৩। আয়নার একি আজগবি কৌতুক, একদিকে তার নিত্যানন্দ,
আর দিকে সুখ দুখ ;
আবার, সকল ঘটে, তুমি বটে, নাইক কিছুর ভিতরে।
(আবার তুমি)

৪। দেখে শুনে কাঙ্গাল বিভোলা, পড়ে থাকে একদিকে,
যায় আর দিকের বেলা ;
ও তা, লোকে দেখে, অন্ধ চোখে, খেলাকে বুঝ্‌তে পারে।
(হৃদয়ে তোমার)

(৪)

দেখ্‌লে, নয়নভঙ্গী, দেশের সঙ্গী, মানুষ চেনা যায়।
সত্য, জ্ঞান প্রেমে মাতোয়ারা, কোন নেশা নাহি যায়॥
(গাজা ভাঙ্গা মদ সিদ্ধি) (শুধুই আঁখি ঢুলুঢুলু)

১। স্ত্রী-পুরুষ তার, পরমার্থ ভাই, পদপদার্থ ধনজনে কোন স্বার্থ নাই ;
ও সে, কি স্বদেশ, কি বিদেশ, মিত্র দেখে সমুদায়।
(ও তার শত্রু নাই রে ত্রিজগতে) (কাফের বিনে)

২। প্রেম-পীযূষ পানে, আঁখি ঢুলুঢুলু অথির চরণে চলে কথা বলে ভুল;
ও সে, ডেকে ডেকে, ভাইভগ্নীকে, ভবের খেলা ভাঙ্গ ত্বরায়।
(বলে) (দেশের মানুষ সবাই আয় রে দেশে)
(বিদেশে আর থাকিস্‌নে)

৩। দেশের মানুষ, চিন্‌লে পরে, কেবা দ্বেষ করে,
সকলেই নিকটে বসায়, তারে আদরে ;
উভয় দেশের মানুষ, পেয়ে বেহুঁস, দেশের কথায় দিন কাটায়।
(দেশের মানুষ পেয়ে), (খেলার কথা ভুলে গিয়ে) (সংসার)

৪। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে বলে ভাই !
আপন দেশের মত মধুর কোন বস্তু নাই ;
ছেড়ে, আপন দেশে, কোথায় এসে, ভুলে রয়েছি মায়ায়।
(কারু দেশের কথা মনে নাই) (সেই পিতামাতা)

(৫)

যদি রে ব্রাহ্মণ হবে, ভাইরে তবে, যজ্ঞসূত্র কর ধারণ।

১। দয়া যে তুলার ক্ষেত্র, সন্তোষসূত্র, গ্রন্থি দাও ইন্দ্রিয় দমন ;
ওরে ভাই, সত্য কথন, হরিস্মরণ,
উপবীত কর গ্রহণ ॥ (যদি রে ব্রাহ্মণ হবে)

২। ওরে, এই যজ্ঞসূত্র, সুপবিত্র, নরনারীর হৃদয়ের ধন ;
এ সূত্র নদীর জলে, নাহি ডোবে, আগুন দিলে হয়না দাহন।
(এই যজ্ঞসূত্র)

৩। মলমূত্র শুদ্ধ সমান, শত বলবান্ টান্‌লেও ছিন্ন হয় না কথন ;
এ দেহ অস্ত হোলে, সঙ্গে চলে, আত্মাকে করিয়ে বেষ্টন।

৪। কাঙ্গাল কয় টিপের সূতায়, বিবাদ বাধায়,
জাতির ধোকায় ব্রাহ্মণগণ ;
যাতে, জ্ঞাতিমালা গাঁথা, সেই যে সূতা, থাকে কোথা হোলে মরণ॥
(চিতাশয্যা যখন)

(৬)

কাঙ্গাল, দেখরে আনন্দ-বনে, এক তরুর দুটী ফল।
ফলের নাম জ্ঞান-প্রেম, ব্রহ্ম-স্বরূপ নিরমল।
(এই দুয়ের মাঝে অনন্ত) (উমাধব, রাধাধব)

১। এক বৈরাগী, একই শিক্ষে, একমন্ত্রে এক দীক্ষে ভিক্ষে,
বিস্ময়ী প্রেম-ভক্তির চক্ষে, নবীন কিশোর যোগীযুগল।
(দেখ্‌রে, জ্ঞানযোগী, প্রেমযোগী) (জ্ঞান দে, প্রেম দে ব'লে)
(কিশোরীর অনুরাগে) (জ্ঞান প্রেম) (এক প্রেম দুই হ'য়ে)

২। অন্নের ভিখারী যোগী, প্রসাদ-জ্ঞানের অনুরাগী,
জ্ঞানের লাগি সর্ব্বত্যাগী, চক্ষে মন্দাকিনীর জল।
(জটা খ'সে বক্ষে বহে) (যোগীর)

৩। প্রেম্-ভিখারী যোগী কাঁদে, "রাই ভিক্ষা দে ! রাই ভিক্ষা দে"
নয়নধারা বহে হৃদে, প্রেম কালিন্দীর জল।
(চূড়া খ'সে রাইয়ের পায়ে পড়ে) (প্রেমের পরাকাষ্ঠা)

৪। অন্ন-জ্ঞান প্রেমভক্তি, দুইদিকে দুটী শক্তি,
দুই স্বরূপে দুটী উক্তি, "দেহি ! দেখি" ধ্বনি কেবল।
(অন্ন দে মা ! প্রেম দে মা) (অন্ন দে গো ! প্রেম দে গো)

৫। কাঙ্গাল-ফিকির ভেবে দেখ্‌ রে, দুতী স্বরূপ, শক্তি এক রে ;
জ্ঞান দে ! প্রেম দে ! বল্‌রে জ্ঞানে প্রেমে ক'রে যুগল।
(শিবকালী, রাধাশ্যাম,) (জ্ঞানানন্দ) প্রেমানন্দ)

(৭)

বসে আছ মূলেতে, ত্রিজগতে, তাই হোতেছে যা করিছ !
১। লোকে সব আপনি ক'রে এমনি ক'রে,
মায়া ভেল্‌কী লাগায়েছ ;
আমি আমি আমি ব'লে, এক জোঁয়ালে,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরাতেছ।
(মায়া ভেল্কী দেখাইয়ে)
২। আমি আমি ব'লে লোকে, জ্ঞানের চোখে
ঠুসী দিয়া রাখিয়াছ ;
দেশ শুদ্ধ বলদ্‌ কোরে, নাচের ঘরে,
আজব নাচন নাচাতেছ।
(এ ভবের নাটক-ঘরে)
৩। এ সংসারে কেহ রাজা, কেহ প্রজা,
গজা অজা বানায়েছ ;
সাজায়ে নানা বেশে, আপনি শেষে,
ঘরে বোসে দেখিতেছ।
(যেন কিছু জান না গো)
৪। বোঝে না পণ্ডিত দলে, তাইতে বলে,
তুমি উদাসীন রয়েছ ;

মায়া এক, ভেল্কী কোরে, কর্ম্মডোরে,

ব্রহ্মাণ্ড বেঁধে রেখেছ।

(লোকে, আপন কর্ম্ম আপনি করে)

৫। ফিকির কয়, হোলেম ফকীর, তবু ফিকির,

ভেঙ্গে কিছু না বলিছ ;

কেন বা, এমন কোরে, চুলে ধ'রে,

ফকীর ব'লে নাচাইছ।

(নাচাও, কেন না চাও ফিরে)

৬। কাঙ্গাল কয়, কর্ম্মীজনে, সংসার বনে,

সং সাজায়ে নাচাইছ ;

জ্ঞানীরে তা দেখায়ে, চোক্ বাঁধিয়ে,

আঁধার কোটায় ঘুরাইছ ॥

(দুই চোখে ঠুসী দিয়ে)

৭। বলিছে, কাঙ্গাল ফিকির, বুঝলাম ফিকির,

সবই তুমি নাচাতেছ ;

ওহে ! তোমার ভক্তের কাছে, নানা সাজে,

আপনি কেবল নাচিতেছ।

(ভক্ত যেমন নাচায়) (ভক্তের তালে তালে)

(যশোদার কাছে গোপাল)

(ছিদামের সঙ্গে রাখাল) (নিকুঞ্জে মদনগোপাল)

(মদনমোহন মদনগোপাল)

ও ভাই, জ্ঞান অজ্ঞান, দুই যে সমান,

নাস্তি আর অস্তি।

একটু ভেবে দেখ, দেখে শেখ,

শিকস্তি আর পয়স্তি ॥

(নদ নদীর) (একবার আছে একবার নাই)

১। জলে যদি মিশে যায় মাটী, তবে মাটী দেখে কেউ আবার

জল দেখে খাঁটী ;

মাটী, নাইরে তখন, দেখ যেমন,

তেমনি নাস্তিকের নাস্তি।

২। জল সরিলে মাটী যে জাগে,

(ও যার) চোক ফুটেছে, সেইত দেখে সেই মাটী আগে ;

ও যার, চোক্ ফোটে নাই, সে বলে নাই,

চোক্ থাকিতেও সিকস্তি ॥

৩। সাধন কর বিশ্বাসে ধ'রে,

চোক ফুটিলে দেখ্‌তে পাবে আপনার ঘরে ;

ও সেই, অস্তি নাস্তি, সৃষ্টি স্থিতি,

মাত করে সকল কিস্তী।

(পীলের চাপে আঁধার করে) (খেলার শেষ এই)

৪। মোহপীল মায়ের দাস এসে,

জীবন কিস্তীর মুখে যখন চাপিয়ে বসে ;

তখন, মাটী নাই আর, সব নিরাকার

ফক্কিকার সব পয়স্তি ॥

(আমি থেকেও যে নাই)

৫। ফিকির বলে, ফিকির ব'লে দিই,
দিন কত ভাই একটু ভাব, আমি তবে কি ;
আমির, আভাস যত, পাবে তত,
তুমি যাহার পয়স্তি ॥
(সিকস্তি সে হয়রে কিসে)

৬। কাঙ্গাল বলে, কাঙ্গাল হ'য়ে ভাই,
একবার ফিকিরের ফিকিরে আছে কি রে নাই ;
তুমি, নিজে নিজে বুঝে ,
খুঁজে পাবে সিকস্তি ॥
(তুমি আমি পয়স্তির)

৭। কাঙ্গাল ফিকির আবার বলে ভাই,
যখন, প্রাণে জাগে, তখন আছে তার পরে আর নাই ;
এই ত, একবার অস্তি, একবার নাস্তি,
অস্তি নাস্তি দুই কিস্তি।
(জ্ঞান অজ্ঞানের)

(৯)

বৈরাগী হয় যে মনে, ও তার ভয় কি আছে রে শমনে।
সদা শমনদমন, মধুসূদন আছে তার মন-ভবনে।

১। দেখ জ্ঞান অসিতে, যে নাশিতে পারিয়াছে রিপুগণে ;
হয়ে রাজার রাজা মহারাজা, ভয় কি করে সে মরণে।

২। সকল ক্ষুৎপিপাসা, ভবের আশা, মিটে যায় তাঁর নামের গুণে ;
সে যোগাসনে, নিরঞ্জনে ভাবে হৃৎপদ্মাসনে।

৩। ভব নদীর তুফান, পর্ব্বতপ্রমাণ, কি করিবে সেই জনে ;
তার কিসের শঙ্কা, নামের ডঙ্কা মেরে পার হয় তুফানে।

৪। হ'য়ে বৈরাগী, জাতিত্যাগী, ভজে যে জন রিপুগণে ;
ধরে সে কৌপীন ঝোলা, জপের মালা কেবল ভাই অকারণে।

৫। যে জন ব্যবসা তরে, কৌপীন মেরে বেড়ায় ঘুরে সংসার-বনে ;
তার ছাপা ফোঁটা, সকল ঝুঁটা, গরিবচাঁদ ফিকিরে ভণে।

(১০)

হায় রে, এই সংসারেতে সুখ আশা কেবল বিড়ম্বনা।
লোকের সুখ-বাসনা, সাপের ফণা, করে ধারণ রে। (রজ্জু ভ্রমে)

১। আজি কেউ মনোল্লাসে, রাজসিংহাসনে ব'সে হাসে,
কা'ল আবার শত্রু এসে রোষে করে বন্ধন ;
তখন কোথা পাত্র, কোথা মিত্র, দারা পুত্র,
কোথায় রয় রে ধন।

২। আজি কেউ ধনের তরে, ওরে বুক ফুলায়ে অহঙ্কারে,
কারে মারে, কারে ধরে, কারে করে ভৎর্সন ;
আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে,
দেশে দেশে করে ভ্রমণ।

৩। আজি কেউ পুত্রধনে, ওরে হৃদে রেখে সযতনে,
স্নেহে সেই চাঁদবদনে করে শত চুম্বন ;
কা'ল আবার ধরাতলে তারে ফেলে,
মৃতদেহে অশ্রুবর্ষণ রে।

৪। কাঁদিয়ে কাঙ্গাল বলে, ওরে সুখ যদি চাও ভূমণ্ডলে,
অভিমান-গরল ফেলে সরল কর হৃদয় মন ;
ছাড় দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা,
পরকুৎসা, পরপীড়ন রে।

(১১)

এ দেহের গরব কি রে, বিচার ক'রে দেখ একবার নিজের মনে

১। ওরে যার সকল আসার, সৌন্দর্য্য তার
বল শুনি রে কোন্ স্থানে;
রক্ত আর মাংসপিণ্ড, মলভাণ্ড,
জড়িয়ে আছে নাড়ির সনে।

২। এ দেহ হাড়ে জোড়া, দড়িদড়া,
ঢাকা চামড়ার আবরণে;
দেখ্ আবার তাতেও রে ভাই, বিশ্বাস নাই,
নষ্ট হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

৩। ওরে ভাই, দেহের মত, দেখি না ত,
নিমক্হারাম ত্রিভুবনে;
যতন যে করে এত, তবু সে ত
সঙ্গে যায় না মরণ দিনে।

৪। কাঙ্গাল কয় দেহ অসার, হয় রে সুসার,
সার বস্তুর অন্বেষণে;
তাঁরে না তত্ত্ব ক'রে দেহ ধ'রে
মলেম ব্যাধির তাড়নে।

(১২)

আয় রে আয়, কে দেখ্‌বি সাধকের সংসার আনন্দময়।
সংসারের জ্বালা যাবে, শীতল হবে তাপিত হৃদয়!

১। মায়ের কোলে ছেলে হাসে, স্তন্যপানে সুখে ভাসে,
আবার স্নেহাভাসে মায়ের মুখ কি শোভা পায়;

সাধক স্ত্রীর কোলে দেখে ছেলে,

ভেসে যায় রে চোখের ধারায়। (গণেশজননী ব'লে)

২। ছেলে কোলে ল'য়ে আবার, মুখে তুলে দিচ্ছে আহার!

যখন হাত পেতে 'দে দে' ব'লে ছেলে যে তাঁর ;

সাধক আর কি রে রয়, নাচিয়ে কয়,

খাও রে আমার আনন্দলাল। (প্রাণের গোপাল)

৩। মেয়েটীকে বুকে ল'য়ে, সাজায়ে অলঙ্কার দিয়ে,

মেয়ে হেসে হেসে স্নেহরসে ভেসে বেড়ায় ;

সাধক হৃদয় পরে মেয়ে ধ'রে

চক্ষু মুদে অজ্ঞান হয়। (এই আমার উমা ব'লে)

৪। ধড়া চূড়া বেঁধে দিয়ে,ছেলেরে কৃষ্ণ সাজায়ে,

মেয়েটীকে দাঁড় করে তাহার বাঁয়ে ;

কভু শিব গৌরী সাজাইয়ে

যুগলরূপে পাগল হয়। (ভক্ত সাধক)

(১৩)

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তাঁয়।

তাঁরে না হেরে প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।

১। আমি সযতনে যে রতনে, রাখিলাম পূরে হিয়ায় ;

আমার ঘুমের ঘোরে চুরী ক'রে, সে রতন কে নিল রে হায়!

২। সে জন ছিল হৃদে, নয়ন মুদে দেখিতে তাঁর আঁখি যে চায় ;

সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে জলে যে অমনি ভেসে যায়।

৩। আমার ব্যথায় ব্যথিত, এমন সুহৃদ্ বল কেবা আছে কোথায় ;

ও সেই হারা ধনে ধ'রে এনে দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায়!

৪। যে ধন হ'য়ে হারা পাগলপারা, প্রাণপাখী মোর উড়ে বেড়ায় ;
ওরে জলে স্থলে আকাশতলে কোথাও দেখিতে না পায়।

৫। আমি সব হারায়ে যে ধ'ন ল'য়ে, বাস করিতাম এ ঘরতলায় ;
যদি গেল সে ধন, তবে এখন করে কাঙ্গাল আর কি উপায়।

(১৪)

অনন্ত রূপের সিন্ধু উথলি উঠিল গো।
কিবা ভুবনমোহন, রূপের তরঙ্গে ভুবন ভুলাল গো।

১। হৃদে ছিল রূপবিন্দু ক্রমে সিন্ধু হোলো গো ;
আহা, নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে হিমগিরি ডুবিল গো !

২। রূপের তরঙ্গে আবার গগন ছাইল গো ;
আহা, বিমল বাতাসে আকাশে আকাশে, সে তরঙ্গ ছুটিল গো।

৩। ভানু শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল গো ;
সংখ্যাশূন্য তারাদলে রূপস্রোতঃ চলে, রূপমদে পাগল গো। (কাঙ্গাল)

৪। অনন্ত এ রূপসিন্ধু নাহি ইহার কূল গো।
রূপে সন্তরণ দিয়ে কূল নাহি পেয়ে মাতিয়ে রহিল গো। (কাঙ্গাল)

সমাপ্ত